শরৎ-পরিচয়

শরৎ-পরিচয়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া
কলিকাতা-৩৭

শৈশব-সুহৃৎ, চিরপলাতক

শ্রীভূপতি মজুমদার

করকমলেষু

শরৎ-পরিচয়

বাংলা-সাহিত্যে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘকাল সুদূর ব্রহ্মদেশে অজ্ঞাতবাসের পর যেদিন তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিলেন, সেই দিনই সারা বাংলা দেশ তাঁহাকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাইল, দরদী কথা-সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র স্বীয় রচনা-মাধুর্য্যে এবং প্রকাশভঙ্গীর অভিনবত্বে বাঙালী পাঠক-পাঠিকার মন জয় করিয়া লইলেন। শরৎ-সাহিত্যের প্রেরণা যোগাইয়াছে তাঁহার ঘটনাবহুল, ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ ভ্রাম্যমাণ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা; বাংলা বিহার ও ব্রহ্মদেশ—এই তিনটি প্রদেশের বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় তাহা পরিব্যাপ্ত। জীবনের নানা অবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর নর-নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির যে গভীর পরিচয় তিনি পাইয়াছিলেন, তাহাকেই গল্প-উপন্যাসে রূপায়িত করিয়া গিয়াছেন। শরৎ-সাহিত্যের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিতে হইলে তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবনকথার সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে শরৎ চন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত স্মৃতিমূলক রচনাসমূহ এবং বিভিন্ন ব্যক্তিকে লিখিত পত্রাবলী তাঁহার জীবনীকারের অপরিহার্য্য উপকরণ। শরৎ চন্দ্র নানা সময়ে প্রসঙ্গক্রমে স্বীয় জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির উপর অভিনব আলোকপাত করে।

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

১৮৭৬ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর (৩১ ভাদ্র ১২৮৩) হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে শরৎ চন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। মতিলাল হালিশহরের গাঙ্গুলী-বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্বশুর কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তখন চারি ভাই—দীননাথ, মহেন্দ্রনাথ, অমরনাথ ও অঘোরনাথ সহ ভাগলপুরের বাঙ্গালীটোলায় একত্র বাস করিতেন। কেদারনাথের পিতা রামধনই ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভাগলপুরে আসিয়া বসবাস সুরু করেন। প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী বলিয়া ভাগলপুরে গাঙ্গুলী-পরিবারের খ্যাতি ছিল। শরৎ চন্দ্রের আপন মাতুল—ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাস গঙ্গোপাধ্যায়; মহেন্দ্রনাথের পুত্র লালমোহন ও উপেন্দ্রনাথ, এবং অঘোরনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ,—ইঁহারা সকলেই শরৎ চন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল।

বিদ্যাশিক্ষা

মতিলাল ছিলেন সদানন্দ অথচ অস্থিরচিত্ত পুরুষ, এবং উপার্জনে একেবারে উদাসীন। একান্ত স্নেহপরায়ণ পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র শরৎ চন্দ্রও শৈশবে লেখাপড়া অপেক্ষা খেলাধুলাতেই অধিকতর মনোযোগী

ছিলেন। তাঁহার কৈশোর ও প্রথম যৌবন প্রধানতঃ ভাগলপুরে মাতুলালয়েই কাটিয়াছিল। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্থানীয় দুর্গাচরণ এম. ই. স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া টি. এন. জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে প্রবিষ্ট হন। ইহার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার পিতা সপরিবারে দেবানন্দপুরে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে শরৎ চন্দ্র হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। তাঁহার সহপাঠী হুগলী-নিবাসী শ্রীহৃষীকেশ মজুমদার জানাইয়াছেন, শরৎ চন্দ্র ১৮৯৩ সনে এবং ১৮৯৪ সনের প্রথমাংশে ব্রাঞ্চ স্কুলের দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে পুনরায় ভাগলপুরে মাতুলালয়ে যাইতে হইয়াছিল। সাংসারিক অভাব-অনটনের জন্য শরৎ চন্দ্রের মাতা ভুবনমোহিনী দেবী পুত্রকন্যাদের লইয়া মাঝে মাঝে ভাগলপুরে পিত্রালয়ে যাইতে বাধ্য হইতেন। শরৎ চন্দ্রের মাতুলেরা সকলের প্রতি সমান স্নেহ-সেবাপরায়ণ। তাঁহাদের মেজ-দিদিকে পরম আদর-যত্ন করিতেন।

ভাগলপুরে পৌছিয়া শরৎ চন্দ্র ১৮৯৪ সনেই পুনরায় টি. এন. জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে যোগদান করেন এবং পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তাঁহার বয়স তখন ১৮, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে পরীক্ষাদানকালে ১৫ বৎসর ৩ মাস ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগলপুরে শরৎ চন্দ্রের ছেলেবেলার একজন শিক্ষক ছিলেন, এ কথা শরৎ চন্দ্র নিজেই বলিয়া গিয়াছেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শরৎ চন্দ্র এফ. এ. পড়িবার জন্য টি. এন. জুবিলী কলেজে প্রবিষ্ট হন। এই বৎসরই তাঁহার মাতা ভুবনমোহিনী দেবীর মৃত্যু হয় (নবেম্বর ১৮৯৫)। পর-বৎসর টেষ্ট পরীক্ষাদানকালে এমন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিল যাহার ফলে কলেজের কর্তৃপক্ষ শরৎ চন্দ্রকে এফ. এ. পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেন নাই; ১৫৲ টাকা ফি সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া তিনি পরীক্ষা দিতে পারেন নাই—এ কাহিনী ভিত্তিহীন। শরৎ চন্দ্র লেখাপড়া অপেক্ষা বেশী মাতিয়া উঠিয়াছিলেন আমোদ-প্রমোদ, অভিনয় ও গান-বাজনায়। এই সময়ে তাঁহার দিন কি ভাবে কাটিতেছিল, সে পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার তদানীন্তন প্রতিবেশী শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় :—

"ভাগলপুরের খঞ্জরপুর মহল্লায় যখন শরৎ চন্দ্রের পিতা তাঁহার তিন পুত্র এবং এক কন্যা লইয়া বাস করিতেন তখন আমরা ছিলাম তাঁহাদের প্রতিবেশী। আমার অগ্রজ ৺রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন শরৎ চন্দ্রের সহপাঠী এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি বলিতেছি ১৮৯৭ সালের কথা। শরৎ চন্দ্র তখন সম্পূর্ণভাবে বেকার এবং সাংসারিক ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতেই শরৎ চন্দ্র অধিকাংশ সময় কাটাইতেন, যেহেতু রাজা শিবচন্দ্রের পুত্র কুমার সতীশচন্দ্র ছিলেন তাঁহার বন্ধু। সতীশচন্দ্র সঙ্গীত, বিলিয়ার্ড এবং ক্রিকেট খেলাতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন এবং তিনি 'আদমপুর ক্লাব' নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এই আদমপুর ক্লাবের একটি ড্রামাটিক সেব্‌শন ছিল এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে বাংলা নাটক

অভিনয় করা ছিল এই ক্লাবের বৈশিষ্ট্য। 'মৃণালিনী,' 'বিল্বমঙ্গল,' 'জনা' নাটকেব অভিনয়ে শরৎ চন্দ্র যথাক্রমে মৃণালিনী, চিন্তামণি, ও জনার ভূমিকা অভিনয় করিয়া আদমপুর ক্লাবের অভিনয়-সুখ্যাতি বর্দ্ধিত করেন। শরৎ চন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র ইন্দ্রনাথের অরিজিন্যাল বলিয়া যে রাজুর [রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারেব] উল্লেখ করা হয়, তিনি উপরোক্ত মৃণালিনী ও বিল্বমঙ্গল অভিনয়ে গিরিজায়া ও পাগলিনীর অংশ অভিনয় করেন। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল ৺চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয়ের বাটীতে বিল্বমঙ্গল অভিনয় হইবার রাত্রি হইতে রাজু নিরুদ্দেশ এবং এই পর্য্যন্ত তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।" ("শরৎচন্দ্রের বাল্য-কাহিনী": 'বাতায়ন,' শরৎ-স্মৃতি-সংখ্যা, ২৭ ফাল্গুন ১৩৪৪)

সাহিত্য-জীবনের প্রথম অধ্যায়

দেবানন্দপুরে শরৎ চন্দ্রের সাহিত্য-রচনার সূত্রপাত* হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভাগলপুরকেই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার সূতিকাগার বলা যাইতে পারে। বিদ্যালয়ে পঠদ্দশাতেই গল্প-উপন্যাস রচনায় তাঁহার হাতে-খড়ি হয়। তাঁহার প্রাথমিক রচনা "কোরেল" (পরে পরিবর্ত্তিত আকারে "ছবি") গল্প রচনার আরম্ভকাল—২৯ আগষ্ট ১৮৯৩;

---

* এই প্রসঙ্গে 'ভারতবর্ষে' (চৈত্র ১৩৪৪) প্রকাশিত "দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র" প্রবন্ধের ৬৩৬ পৃষ্ঠাও পঠিতব্য।

সমাপ্তিকাল—৩ আগষ্ট ১৯০০। আমি ইহার পাণ্ডুলিপিতে এই তারিখ দেখিয়াছি। শরৎ চন্দ্রের প্রথম যৌবনে লেখা যে সমস্ত গদ্য রচনা* পরবর্তী কালে প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলিতেও তাঁহার প্রতিভার স্পর্শ রহিয়াছে।

শরৎ চন্দ্রের গদ্য শুধু যে স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল তাহা নহে, তাহার মধ্যে একটা গতিবেগ এবং ছন্দও আছে। তাঁহার কথা-সাহিত্যে স্থানে স্থানে কবি-দৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়। কথা-সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র যে সাহিত্য-জীবনের উষাকালে কাব্য-সরস্বতীরও আরাধনা করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারা যায় বাংলা-সাহিত্যে সুপরিচিতা নিরুপমা দেবীর স্মৃতিকথায়; তিনি লিখিয়াছেন :—

"শরৎ দাদা কবিতা লিখিতে পারিতেন শুনিয়াছিলাম, কিন্তু অমিত্রাক্ষরে ছোট্ট একটি 'গাথা' ছাড়া আর কিছু কখনো দেখি নাই। সেটির নাম মনে নাই কিন্তু ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকটি লাইন্ মাত্র তাহার মনে আছে। প্রথম লাইনটি—"ফুলবনে

---

* ১৬-১৭ হইতে ২৪-২৫ বৎসরের মধ্যে লেখা শরৎ চন্দ্রের কয়েকটি প্রাথমিক রচনা:— (১) 'অভিমান' (হেন্‌রি উডের 'ইষ্টলিনে'র ছায়াবলম্বনে)। (২) 'বাসা' বা 'কাকবাসা' (উপন্যাস)। (৩) 'বাগান' তিন খণ্ডে সমাপ্ত : ১ম খণ্ড—বোঝা, কাশীনাথ, অনুপমার প্রেম; ২য় খণ্ড—কোরেল গ্রাম (পরে 'ছবি'), শিশু (পরে 'বড়দিদি') ও চন্দ্রনাথ; ৩য় খণ্ড—হরিচরণ, দেবদাস ও বাল্যস্মৃতি। (৪) 'পাষাণ' (মারি করেলীর *Mighty Atom* অবলম্বনে)। (৫) 'ব্রহ্মদৈত্য' (উপন্যাস), ও (৬) 'শুভদা' (এই অসম্পূর্ণ রচনা পরবর্তী কালে শরৎ চন্দ্র সম্পূর্ণ করেন)। এই সকল প্রাথমিক রচনার মধ্যে 'বাগান' ও 'শুভদা' মুদ্রিত হইয়াছে।

লেগেছে আগুন"। সুপ্রভা আর ইন্দিরা নামে দুইটি নায়িকার (নায়কের নাম মনে নাই) মনোভাব বিশ্লেষণ, পরে যথারীতি একজনের (সুপ্রভার) বিষপানে মৃত্যু এবং সেই পরাজয়েই তাহার জয়ের পতাকা উড্ডীন হওয়া ইত্যাদি—ইহাই 'গাথা'র বিষয় হইলেও বর্ণনায় অনেকখানি ক্ষমতারই প্রকাশ ছিল।" ('ভারতবর্ষ,' চৈত্র ১৩৪৪, পৃ. ৫৯৬)*

মাতার মৃত্যুর পরে শরৎ চন্দ্র যখন পিতার সহিত খঞ্জরপুরে বাস করিতেন তখন নিরুপমা দেবী ("বুড়ী") ও বিভূতিভূষণ ভট্টের ("পুঁটু") সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ইঁহারা ছিলেন তাঁহার প্রতিবেশী। শরৎ চন্দ্র তখন তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজের ছাত্র। নিরুপমা ও বিভূতিভূষণ—ভাই ভগিনী উভয়েই তখন গোপনে কবিতা লিখিতেন। ঘটনাচক্রে নিরুপমার কবিতার খাতাখানি গিয়া শরৎ চন্দ্রের হাতে পড়ে। এই সাহিত্য-চর্চ্চার সূত্রেই শরৎ চন্দ্রের সঙ্গে বিভূতিভূষণের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। নির্ভীকতা, গল্পরচনায় দক্ষতা, অধ্যয়নানুরাগ ইত্যাদির জন্য সমবয়সীরা তখন শরৎ চন্দ্রকে বিশেষ সমীহ করিয়া চলিতেন। এই সম্পর্কে বিভূতিভূষণ লিখিতেছেন :—

> "শরৎ চন্দ্র তখন তাঁহার সমবয়স্কের মধ্যে একজন উচ্চ জগতের জীবরূপে এবং অত্যদ্ভুত "ল্যাড়া" নামে অভিহিত। উপরন্তু তাঁহার তাৎকালিক স্বাক্ষরিত নাম St. Clare Lara।

---

* 'ব্রহ্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র' পুস্তকে (পৃ. ৮৪) শরৎ চন্দ্রের এই উক্তিটি প্রণিধান-যোগ্য :—"দেখ, কবিতা টবিতা এককালে লেখার বাই আমারও ছিল। আমি গাথা লিখতে জানতাম।"

জানি না তখন তিনি কবি Byronএর Lara কবিতা পড়িয়াছিলেন কি না, কিন্তু বায়রণের ধরণটি যে পরে তাঁহাকে পাইয়া বসিবে ইহা বোধ হয় তাহারই পূর্ব্বাভাষরূপে তাঁহার নাম-সহিটির মধ্যেও প্রকটিত হইয়াছিল। আমরা ছোটরা তখন ঐ অদ্ভুত মানুষটিকে দূর হইতে সসম্ভ্রমে দাদাদের পড়িবার ঘরে আসা যাওয়া করিতে বা দাবা পাশা খেলিতে দেখিতাম মাত্র।" ('ভারতবর্ষ,' চৈত্র ১৩৪৪)

শরৎ চন্দ্র শুধু যে শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিকই ছিলেন তাহা নয়,—সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদির অক্লান্ত পাঠকও বটে; এ কথাব প্রমাণ পাওয়া যায় বন্ধুবান্ধবকে লিখিত তাঁহার চিঠিপত্র হইতে। এই পাঠাসক্তির বীজ তরুণ বয়সেই তাঁহার হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার বাল্যরচনায় কোন কোন ইংরেজ লেখক ও লেখিকাব প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তরুণ বয়সে কোন্ কোন্ ইংরেজ ঔপন্যাসিক তাঁহার প্রিয় ছিলেন, কাহাদের রচনা তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতেন, বিভূতিভূষণের স্মৃতিকথা হইতে এ সকল বিষয়ে আমাদের কৌতূহল কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত হয়। তিনি লিখিতেছেন :—

"শরৎচন্দ্র সে সময় যে সকল ইংরাজী ঔপন্যাসিকের উপন্যাস পড়িতেন তাহা এখনো আমার মনে আছে। মিসেস্ হেনরি উড্ এবং মারি করেলীর উপন্যাসের তিনি একজন ভক্ত পাঠক ছিলেন এবং লর্ড লিটনের প্রতিও তাঁহার যে শ্রদ্ধা ছিল তাহারই প্রমাণ তিনি দিয়া গিয়াছেন লিটনের My Novelএর ধরণে শ্রীকান্তের পর্ব্বের পর পর্ব্ব চালাইয়া। অবশ্য শেষ জীবনের বড় বড়

উপন্যাসগুলির বিষয় আমি কিছু বলিতে পারিব না। কারণ তাঁহার সহিত আমার ২১৷২২ বৎসরের বয়সেই প্রত্যক্ষ যোগ একপ্রকার কাটিয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার বাঙ্গলার বাহিরের জীবনের সহিত আমার একেবারেই পরিচয় হয় নাই।...

"বাল্যজীবনে শরৎদাদা যে সমস্ত ঔপন্যাসিকের লেখা বেশী করিয়া পড়িতেন তাহার মধ্যে চার্লস্ ডিকেন্স* বোধ হয় তাঁহার কাছে বেশী আদর পাইয়াছিলেন। অনেক দিন ডিকেন্সের ডেভিড্ কপারফিল্ড হাতে করিয়া এখানে সেখানে—এ-বাড়ী ও-বাড়ী পর্য্যন্ত করিতে দেখিয়াছি। মিসেস্ হেন্‌রি উডের ইষ্টলিন্ খানিও প্রায় তদ্রূপ আদরই পাইয়াছিল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের শেষ বয়সের লেখার মধ্যে ডিকেন্স বা উডের লেখার তেমন প্রভাব দেখা গিয়াছিল কি না সন্দেহ। বোধ হয় মধ্য বয়সে কলিকাতা রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে তিনি যে সমস্ত আধুনিক লেখকদের লেখার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন তাহারই ফল তাঁহার লিখিত উপন্যাসে প্রচুর পরিমাণে দিয়া গিয়াছেন।" ('ভারতবর্ষ,' চৈত্র ১৩৪৪)

শরৎ চন্দ্রের অল্প বয়সের যে-সমস্ত রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলিতেও তাঁহার সাহিত্যিক গুণপনার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার কোন কোন বাল্যরচনা চিরতরে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে শরৎ চন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন :—

---

* পরিণত বয়সেও তিনি ডিকেন্সের ভক্ত ছিলেন।—'ব্রহ্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র,' পৃ. ৬৬-৬৭ দ্রষ্টব্য।

"ছেলেবেলার লেখা কয়েকটা বই আমার নানা কারণে হারাইয়া গেছে। সবগুলার নাম আমার মনে নাই। শুধু… দুখানা বইয়ের নষ্ট হওয়ার বিবরণ জানি। একখানা—'অভিমান' মস্ত মোটা খাতায় স্পষ্ট করিয়া লেখা,—অনেক বন্ধুবান্ধবের হাতে হাতে ফিরিয়া অবশেষে গিয়া পড়িল বাল্যকালের সহপাঠী কেদার সিংহের হাতে। কেদার অনেক দিন ধরিয়া অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু ফিরিয়া পাওয়া আর গেল না।…

"দ্বিতীয় বই 'শুভদা'।* প্রথম যুগের লেখা ওটা ছিল আমার শেষ বই, অর্থাৎ 'বড়দিদি,' 'চন্দ্রনাথ,' 'দেবদাস' প্রভৃতির পরে।" ("বাল্য-স্মৃতি" : 'ছোটদের মাধুকরী,' আশ্বিন ১৩৪৫)

১৮৯৪ সনে ("বয়স যখন ১৮ পার হয় নাই"—'শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী,' পৃ. ৫৬) শরৎ চন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার বাল্য-সঙ্গীরা ভাগলপুরে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য-সভাও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।† শরৎ চন্দ্র ছিলেন এই সভার সভাপতি। গুরুজনদের রক্তচক্ষু এড়াইয়া

---

* ইহা শরৎ চন্দ্রের মৃত্যুর অল্প দিন পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 'চন্দ্রনাথ,' 'দেবদাস' প্রভৃতির রচনার সহিত মিলাইয়া 'শুভদা' পড়িলে মনে হয় 'শুভদা'ই পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা, পরের লেখা নহে।

† ভাগলপুরের সাহিত্য-সভা সম্বন্ধে নিরুপমা দেবী-লিখিত "পুরাতন কথার আলোচনা" ('জয়শ্রী,' জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০) ও "আমাদের শরৎদাদা" এবং শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টের "আমার শরৎদা" পঠিতব্য। শেষোক্ত প্রবন্ধ দুইটি ১৩৪৪ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে।

কোন নির্জ্জন স্থানে, মাঠে বা গাছতলায় মাঝে মাঝে সভার আয়োজন হইত। সভার মুখপত্র ছিল 'ছায়া' নামে একখান হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা। এই সাহিত্য-সভা সম্বন্ধে শরৎ চন্দ্র তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

"ভাগলপুরে আমাদের সাহিত্য-সভা যখন স্থাপিত হয় তখন আমাদের সঙ্গে শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ ভট্ট বা তাঁর দাদাদের কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না। বোধ হয় একটা কারণ এই যে তাঁরা ছিলেন বিদেশী এবং বড়লোক।··· স্বর্গীয় নফর ভট্ট ছিলেন সেখানকার সব-জজ। তার পরে কি করিয়া এই পরিবারের সঙ্গে আমাদের ক্রমশঃ জানা-শুনা এবং ঘনিষ্ঠতা হয়, সে-সব কথা আমার ভাল মনে নাই। বোধ হয় এই জন্য যে, ধনী হইলেও ইঁহাদের ধনের উগ্রতা বা দাম্ভিকতা কিছুমাত্র ছিল না। এবং আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম বোধ হয় এই জন্য বেশী যে, ইঁহাদের গৃহে দাবা-খেলার অতি পরিপাটি আয়োজন ছিল। দাবা-খেলার পরিপাটি আয়োজন অর্থে বুঝিতে হইবে—খেলোয়াড, চা, পান ও মুহুর্মুহু তামাক।

"সম্ভবতঃ এই সময়েই···শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ আমাদের সাহিত্য-সভার সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হন। আমি ছিলাম সভাপতি, কিন্তু আমাদের সাহিত্য-সভায়···গুরুগিরি করিবার অবসর অথবা প্রয়োজন আমার কোন কালেই ঘটে নাই। সপ্তাহে একদিন করিয়া সভা বসিত এবং অভিভাবক গুরুজনদের চোখ এড়াইয়া কোন একটা নির্জ্জন মাঠের মধ্যেই বসিত। জানা আবশ্যক যে সে-সময়ে সে দেশে সাহিত্য-চর্চ্চা একটা গুরুতর অপরাধের মধ্যেই

গণ্য ছিল। এই সভায় মাঝে মাঝে···কবিতা পাঠ করা হইত। গিরীন পড়িতে পারিত সব চেয়ে ভাল, সুতরাং এ-ভার তাহার উপরেই ছিল, আমার 'পরে নয়। কবিতার দোষগুণ বিচার হইত এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সাহিত্য-সভার মাসিক-পত্র 'ছায়া'য় প্রকাশিত হইত। গিরীন ছিলেন একাধারে সাহিত্য-সভার সম্পাদক, 'ছায়া'র সম্পাদক ও 'অঙ্গুলী-যন্ত্রে' অধিকাংশ লেখার মুদ্রাকর। এ সম্বন্ধে এই আমার মোটামুটি মনে পড়ে।

"সাহিত্য-সভার সভ্যগণের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ছিলেন··· বিভূতি। যেমন ছিল তাঁর পড়াশুনা বেশী, তেমনি ছিলেন তিনি ভদ্র এবং বন্ধুবৎসল। সমজদার সমালোচকও তেমনি।···"

এই সাহিত্য-সভায় সভ্যগণের রচিত গল্প-কবিতাদি পঠিত হইত। নিরুপমা দেবীও এই সভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন; তিনি থাকিতেন অন্তরালে এবং অপর কোন সভ্য তাঁহার রচনা পাঠ করিতেন। পাঠ সমাপন হইলে রচনাগুলির সমালোচনা হইত। সাহিত্য-সঙ্গীদের ভিতর যাহাতে সমালোচনা-শক্তির বিকাশ-সাধন হয় সেজন্য শরৎ চন্দ্র সাধ্যমত প্রয়াস পাইতেন, নানা প্রকার নির্দ্দেশ দিতেন। সভার মুখপত্র 'ছায়া'র ভিতর দিয়া সভ্যদের সমালোচনা-শক্তি যে ক্রমবিকশিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা বিভূতিভূষণের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায়:—

"এই সময় শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বোধ হয় কলিকাতায় পড়িতেন। তিনি এবং তাঁহার কয়েকটি বন্ধুতে মিলিয়া ভবানীপুরে আমাদের 'ছায়া'রই মত আর একখানা কাগজ

হস্তযন্ত্রেই বাহির করিয়াছিলেন। তাহার নামটা ঠিক স্মরণ হয় না—বোধ হয় 'তরণী'। যাহাই হউক সেই কাগজখানা আমাদের ছায়ার বিনিময়ে ভাগলপুরে পাঠান হইত। আমরা তাহা পাঠ করিয়া ফেরত পাঠাইতাম। বোধ হয় শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ভায়ারও ঐ তরণীতেই সাহিত্যসাধনার হাতে খড়ি। আমাদের 'ছায়া'তে ঐ কাগজের লেখকগণের মুণ্ডপাত হইত এবং যথানিয়মে আমাদের মুণ্ডপাতও ভবানীপুরের বন্ধুরা তাঁহাদের কাগজে করিতেন। কি গুরুগম্ভীর সেই সমালোচনা—যদি সে সময়ের 'সাহিত্য'-পত্রিকার সম্পাদক ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ও তাহা পড়িতে পাইতেন তাহা হইলে তিনিও নিশ্চয় বুঝিতেন যে তাঁহার উপযুক্ত সমালোচক-বংশধর তখনই অনেক বাঁশবনের ঝোপেঝাড়ে প্রচুর গজাইয়া উঠিতেছে।"

যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যেও শরৎ চন্দ্র ছেলেবেলা হইতেই গতানুগতিক পথ ধরিয়া চলেন নাই; তরুণ বয়স হইতেই নূতন পথে তাঁহার যাত্রা, তাই সাহিত্যেও তিনি পথিকৃৎ। তাঁহার এই আদর্শ তাঁহার বাল্যকালের সাহিত্য-সঙ্গীদেরও অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বিভূতিভূষণ বলিতেছেন :—

"শরৎ চন্দ্র চিরদিনই বেপরোয়া—কোনো দ্বিধা তাঁহাকে কখনো বাধা দিতে পারিত না এবং শেষ জীবনে এই একান্ত নির্ভীকতার ভাবকেই সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া কত না নূতন জীবনের সৃষ্টি এবং নূতন ভাবকে রূপ দিয়া গিয়াছেন। সেই জন্যই বোধ হয় তিনি বাল্যজীবনের এই সঙ্গী কয়টির অনেকেরই

মধ্যে ইহা সঞ্চারিত করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র সঙ্গী কয়টিকেও এই সময় অনেকটা বেপরোয়াই করিয়া তুলিয়াছিলেন।"

বাল্যকাল হইতেই শরৎ চন্দ্র ছিলেন নির্ভীক, সত্যসন্ধ। তাঁহার বিদ্রোহী মন কোন বন্ধন স্বীকার করিতে চাহিত না। * সাহিত্যেও তিনি নির্ভীকভাবে নিজের অভিজ্ঞতা ও সত্যোপলব্ধিকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, গোড়া হইতেই তাঁহার রচনায় যুক্তিহীন সমাজ-বিধানেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। * এই নিয়মের অনুশাসন অগ্রাহ্য কবিবার প্রবণতা এবং বেপরোয়া ভাব ছিল বাল্যকাল হইতেই তাঁহার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে বিভূতিভূষণের নিম্নোক্ত কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য :—

"আমাদের খঞ্জবপুরের বাড়ীর পাশেই একটা মসজিদ ছিল এবং হয়তো এখনও আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলা কবর আছে। আমরা হিন্দুর ঘরের ভীরু ছেলে, কিন্তু এই পরম সাহসিকটির সঙ্গগুণে 'আমদো' ভূতই বল—আর ব্রহ্মদৈত্যই বল—সকল ভয়কেই তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছিলাম। কত গভীর অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি এই কবরস্থানের মধ্যেই কাটিয়া গিয়াছে। শরৎদার বাঁশি চলিতেছে—না হয় হারমোনিয়ম সহ গান চলিতেছে এবং আমরা ২।৪ জন বসিয়া তন্ময় হইয়া শুনিতেছি। কখনো বা গভীর অন্ধকার রাত্রে গুরুজনের রক্তনয়ন এবং দাদাদের চপেটাঘাত উপেক্ষা করিয়া গঙ্গার চড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি কিম্বা থিয়েটারের রিহার্সাল-কক্ষে বাঁশ মাথায় দিয়া সতরঞ্চিতে পড়িয়া রাত্রি কাটাইয়াছি। বাল্যকাল হইতে তিনি ভয় কাহাকেও করিতেন

না এবং কোনো ন্যায়-অন্যায়ের বাধাও তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না। বহু দিনের বহু কার্য্যে তিনি ইহা দেখাইয়াছিলেন এবং সেই জন্যই বোধ হয় তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার নিজ প্রকৃত জীবনের এবং সৃষ্ট জীবনের মধ্যেও সেই একান্ত নির্ভীকতা পরিস্ফুট হইয়াছিল। আমাদের মত অনেক ভীরু যেখানে গিয়া থামিতে বাধ্য হইয়াছে তিনি সেখানে থামেন নাই।”

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎ চন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধার কথা সুবিদিত। তিনি তাঁহাকে অন্তরে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন যে, এক মাত্র বেদব্যাস ছাড়া এত বড় কবি আর আমাদের দেশে জন্মান নাই। ১৩৩৮ সালের পৌষ মাসে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে শরৎ চন্দ্র যে ভাষণ দেন তাহাতে ছেলেবেলায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনার সহিত কি করিয়া তাঁহার পরিচয় হয়, সেই প্রসঙ্গে বলেন :—

“ছেলেবেলার কথা মনে আছে, পাড়াগাঁয়ে মাছ ধ'রে, ডোঙা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন গামছা কাঁধে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বা'র হই, ঠিক বিশ্বকবির কাব্যের নিরুদ্দেশ-যাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হ'লে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে নির্জ্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর অভ্যর্থনার পালা শেষ হ'লে অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান ক'রে দেন। সেখানে আর এক দফা সম্বর্দ্ধনা লাভের পর আবার বোধোদয়,

পন্থপাঠে মনোনিবেশ করি। আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্ট সরস্বতী কাঁধে চাপে, আবার সাগরেদি সুরু করি, আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা, আবার ফিরে আসা, আবার তেমনি তাদের আপ্যায়ন সম্বর্দ্ধনার ঘটা—এমনি ক'রে বোধোদয়, পন্থপাঠ ও বাল্যজীবনেব এক অধ্যায় সমাপ্ত হ'ল।

"এলাম শহরে, একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনেরা ভর্ত্তি ক'রে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে। তার পাঠ্য—সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাবশতক ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু পড়ে যাওয়া নয়, মাসিকে সাপ্তাহিকে সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতেব কাছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং অসঙ্কোচে বলা চলে যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো চোখের জলে। তার পরে বহু দুঃখে আর একদিন সে মিয়াদও কাটলো। তখন ধারণাও ছিল না যে, মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য আছে।

"যে পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য উপন্যাস দুর্নীতিব নামান্তর, সঙ্গীত অস্পৃশ্য; সেখানে সবাই চায় পাস করতে এবং উকীল হ'তে; এরই মাঝখানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও বিপর্য্যয় ঘটলো। আমাব এক আত্মীয় [মাতুল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়] তখন বিদেশে থেকে কলেজে পড়তেন, তিনি এলেন বাড়ী। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ; কাব্যে আসক্তি; বাড়ীর মেয়েদের জড় ক'রে তিনি একদিন প'ড়ে শুনালেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। কে কতটা বুঝলে

জানি নে, কিন্তু যিনি পড়ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো। কিন্তু পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এলাম। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয় বার পরিচয় ঘটলো, এবং বেশ মনে পড়ে এইবারে পেলাম তার প্রথম সত্য পরিচয়। এর পরে এ বাড়ীর উকীল হবার কঠোর নিয়ম-সংযম আর ধাতে সইল না ; আবার ফিরতে হ'ল আমাদের সেই পুরণো পল্লীভবনে। কিন্তু এবার আর বোধোদয় নয়, বাবার ভাঙা দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম 'হরিদাসের গুপ্ত কথা' আর বেরোলো 'ভবানী পাঠক।' গুরুজনদের দোষ দিতে পারি নে, স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদ্‌ছেলের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই ক'রে নিতে হ'ল আমাকে বাড়ীর গোয়ালঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে। এখন আর পড়ি নে, লিখি। সেগুলো কারা পড়ে জানি নে। একই স্কুলে বেশী দিন পড়লে বিদ্যা হয় না, মাষ্টার মশাই স্নেহবশে একদিন এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। অতএব আবার ফিরতে হ'ল শহরে। বলা ভাল, এর পরে আর স্কুল বদলাবার প্রয়োজন হয় নি। এইবার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস-সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে তখন ভাবতেও পারতাম না, প'ড়ে প'ড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। বোধ হয়, এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়, লেখার দিক্ দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে ; কিন্তু চেষ্টার দিক্ দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

২

"তার পরে এল বঙ্গদর্শনের নব পর্য্যায়ের যুগ, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়ল। সে দিনের সে গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলব না। কোন কিছু যে এমন ক'রে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও ভাবি নি। এত দিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, এ কথা সত্য নয়। ওইতো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এত বড় সম্পদ্ সে দিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?" ('জয়ন্তী-উৎসর্গ')

অন্নসংস্থানের চেষ্টায়

পত্নীবিয়োগের পর মতিলাল শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া পুত্রকন্যা সহ ভাগলপুরের খঞ্জরপুর মহল্লায় বাস করিতেন—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দেনার দায়ে তিনি দেবানন্দপুরের বসতবাটীখানিও ২২৫৲ টাকা মূল্যে কনিষ্ঠ মাতুল অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন (১৮৯৬, ৯ই নবেম্বর)।* এই সময়ে পরিবারে অর্থকষ্ট দেখা দেওয়ায় শরৎ চন্দ্রের পক্ষে বেশী দিন বেকার বসিয়া থাকা

* "দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র"—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মুন্সী: 'ভারতবর্ষ,' চৈত্র ১৩৪৪।

সম্ভবপর হইল না, অগত্যা তাঁহাকে অর্থোপার্জনে মন দিতে হইল। বনেলী এষ্টেটে তাঁহার একটি চাকুরীও জুটিয়া গেল। তিনি প্রসঙ্গক্রমে একবার শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে বলিয়াছিলেন :—

"আমি কিছু দিন বনেলী ষ্টেটে কাজ করি। সাঁওতাল পরগণায় তখন সেটেলমেণ্টের কাজ চলূচে। ষ্টেটের তরফ থেকে একজন বড় কর্ম্মচারী সেই কাজে ষ্টেটের স্বার্থ দেখবার জন্য নিযুক্ত হন, তাঁর সহকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলেম।* ডাঙ্গার মাঝে তাঁবুতে থাকতে হতো। কখনো কখনো রাজকুমার সেখানে আসতেন। সেটেলমেণ্টের বড় বড় অফিসারদের তাঁবুতে নেমন্তন্ন ক'রে নাচগানের মজলিস দিতেন। সেই সময় আমরা কয়েক জন মিলে বক্রেশ্বর বেড়াতে যাই। বক্রেশ্বরের শ্মশানটা আমার বড় ভাল লেগেছিল। শিবের মন্দিরের দিকটাও খুব নির্জ্জন।" ('ভারতবর্ষ,' চৈত্র ১৩৪৪, পৃ. ৬০৫)

অস্থিরমতি শরৎ চন্দ্রের মন সংসারে বসিল না, তিনি একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিরুদ্দেশ হইলেন (ইং ১৯০০)। সন্ন্যাসি-বেশে † নানা স্থানে কিছু দিন ঘুরিবার পর তিনি মজঃফরপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে তাঁহার সহিত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য (মুখোপাধ্যায়) ও শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর স্বামী শ্রীশিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। মজঃফরপুরের অনেকেই তাঁহার সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। গায়ক ও বাদক হিসাবে তিনি স্থানীয় জমিদার মহাদেব সাহুর

* 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে সাঁওতাল পরগণার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† 'শ্রীকান্ত', ১ম পর্ব্ব দ্রষ্টব্য।

(ইনিই 'শ্রীকান্তে'র কুমার সাহেব) সুনজরে পড়েন। আমন্ত্রিত হইয়া শরৎ চন্দ্র কিছু দিন এই জমিদারের নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হঠাৎ পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া শরৎ চন্দ্র মজঃফরপুর ত্যাগ করিয়া ভাগলপুরে ফিরিয়া আসেন। অতি কষ্টে পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া তিনি রিক্তহস্তে হাইকোর্টের উকীল—"বোম্ মামা" লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের কলিকাতা, ভবানীপুরের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হন। উপেন্দ্রনাথও তখন অগ্রজের নিকট অবস্থান করিতেছেন। অনেক দিন পূবে আবার শরৎ চন্দ্রকে পাইয়া উভয়েই দুঃখের মধ্যেও আনন্দিত হইয়াছিলেন। "বোম্ মামা" বেকার ভাগিনেয়কে কিছু কিছু উপার্জনেরও সুযোগ করিয়া দিলেন। উপেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

> "একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের এমন অনেক কিছু খরচপত্র থাকে যা প্রতি ক্ষেপে অভিভাবকের নিকট চেয়ে নিতে কুণ্ঠা বোধ হয়। এই অসুবিধা থেকে মুক্তিলাভের জন্য শরৎচন্দ্র হিন্দী অনুবাদ কার্য্য আরম্ভ ক'রে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জন করতে আরম্ভ করেন। হাইকোর্টের Paper Book তৈয়ারী করার ব্যাপারে দাদার অধীনে অনেককেই অনেক কাজ করতে হ'ত। যিনি যে কাজ করতেন তিনি সে কাজের পারিশ্রমিক পেতেন, শরৎচন্দ্রও পেতেন। কিন্তু আইন-আদালতের ভাষার সহিত পরিচয়ের স্বল্পতা হেতু এই কার্য্য বেশী দিন চালানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।"
> ("শরৎ-চন্দ্রের মাতুলালয়" : 'শরৎ স্মরণিকা,' ইং ১৯৪৯)

এই ভাবে কলিকাতায় শরৎ চন্দ্রের ছয়-সাত মাস কাটিল।

ব্রহ্মপ্রবাস

উপেন্দ্রনাথ শরৎ চন্দ্রের আত্মীয় ও বিশ্বস্ত বন্ধু; এক গৃহে একই সংসারে অনেক দিন একত্রে কাটাইয়াছেন। শরৎ চন্দ্র তাঁহারই সহিত পরামর্শ করিয়া এক দিন বাড়ীর কর্ত্তাদের অজ্ঞাতসারে ভাগ্যান্বেষণে রেঙ্গুন যাত্রা করিলেন (জানুয়ারি ১৯০৩)। উপেন্দ্রনাথ গোপনে তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসেন; যাইবার সময় কপর্দ্দকহীন শরৎ চন্দ্র তাঁহার নিকট হইতে চল্লিশটি টাকা কর্জ লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নিঃসম্বল অবস্থায় শরৎ চন্দ্র রেঙ্গুনে তাঁহার মাসীমা—উপেন্দ্রনাথের সহোদরা ভগ্নী অন্নপূর্ণা দেবীর বাড়ীতে (৫৬ ও ৫৬।এ লিউইস ষ্ট্রীট) গিয়া উঠিলেন। তাঁহার মেসোমশাই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন রেঙ্গুনের একজন নামজাদা উকীল। তিনি শরৎ চন্দ্রকে সাদরে আশ্রয় দিলেন এবং গৃহশিক্ষক রাখিয়া তাঁহাকে বর্ম্মী ভাষা শিখাইতে লাগিলেন; দু-তিন মাস পরে বর্ম্মা-রেলওয়ের এজেণ্ট জন্‌ সাহেবকে অনুরোধ করিয়া তাঁহার আপিসে পঁচাত্তর-আশী টাকার একটি চাকরিও সংগ্রহ করিয়া দিলেন। অঘোরনাথের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, অদূর ভবিষ্যতে শরৎ চন্দ্রকে ওকালতি-কার্য্যে বহাল করিবেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই; ১৯০৫ সনের ৩০এ জানুয়ারি নিউমোনিয়ায় ভুগিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে পত্নী অন্নপূর্ণা দেবী নিকটে ছিলেন না; কন্যার বিবাহের বন্দোবস্তের জন্য তিনি তখন কলিকাতায়। স্বামীর মৃত্যুর দেড় মাস পরে তিনি রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসেন। শরৎ চন্দ্র তাহার অল্প দিন আগেই সে বাড়ী ত্যাগ করিয়া

গিয়াছেন। অঘোরনাথের পীড়ার সময় তিনি যে ঘোর পানাসক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে সংবাদ কলিকাতায় তাঁহার মাসীমার গোচরে আসিয়াছিল।

মেসোমশাইয়ের মৃত্যুর তিন-চারি মাস পরে শরৎ চন্দ্র সাহেবের সহিত ঝগড়া করিয়া এজেণ্ট আপিসের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়াছিলেন। তিনি অতঃপর অন্নসংস্থান ব্যপদেশে রেঙ্গুন ছাড়িয়া উত্তর-ব্রহ্মে গমন করেন। সেখানে আমহার্ষ্ট জেলার মৌলমিন-পিগুতে পি. ডবলিউ. ডি.র হিসাব-।বভাগে ডেপুটি এগ্‌জামিনার-অব-একাউণ্টস এম. কে. মিত্রের সুপারিশে সত্তর-আশী টাকার একটি চাকুরী জুটিল (ইং ১৯০৫); তাঁহার উপরিওয়ালা কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সি. কে. সরকার, তৎকালে অ্যাসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনিয়ার পি. ডবলিউ. ডি.। কিন্তু দুই-তিন মাসের অধিক কাল শরৎ চন্দ্র এই পদে স্থায়ী হইতে পারেন নাই; তিনি তখন উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতেছেন, শনি হইতে মঙ্গলবার তাঁহাকে বড়-একটা আপিসে পাওয়া যাইত না।

শরৎ চন্দ্র আবার রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসিলেন। এবার তিনি রেলওয়ে হিসাব-বিভাগেব এগজামিনার গঙ্গারাম কাউলাব সাহায্যে তাঁহার অধীনে কেরাণীর পদলাভ করেন; দু-তিন মাসেব পর এ চাকরিও তাঁহাকে ছাড়িতে হইল।

অতঃপর শরৎ চন্দ্র উক্ত মিত্র (ঝামাপুকুর-নিবাসী উকীল রামচন্দ্র মিত্রের পুত্র) মহাশয়ের বাড়ীতে কিছু দিন আশ্রয় গ্রহণ করেন। মণীন্দ্রবাবু পূর্ব্ব হইতেই শরৎ চন্দ্রকে জানিতেন, বিশেষ করিয়া তাঁহার সুকণ্ঠের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারই সহায়তায় শরৎ চন্দ্র শেষে

ডেপুটি একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের আপিসে পাব্‌লিক ওয়ার্কস্‌ একাউণ্টস্‌-বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন।

শরৎ চন্দ্র ব্রহ্মদেশে দীর্ঘ বার-তের বৎসর কাটাইয়াছিলেন।* কেবল ১৯১২ ও ১৯১৪ সনের শেষাশেষি অল্প দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। শিকারী, সঙ্গীতজ্ঞ ও বিলিয়ার্ড খেলায় ওস্তাদ বলিয়া রেঙ্গুনে তাঁহার নামডাক ছিল। কিন্তু প্রবাসে কেবলমাত্র আমোদ-প্রমোদেই তাঁহার অবসরকাল অতিবাহিত হয় নাই; গভীর অধ্যয়নেও তিনি সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি মজঃফরপুরের বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে একখানি পত্রে লেখেন :—

D. A. G.'s Office, Rangoon.
22. 3. 12.

প্রমথ,...আমার সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছ। তাহা সংক্ষেপে কতকটা এইরূপ—

(১) সহরের বাইরে একখানা ছোটো বাড়িতে মাঠের মধ্যে এবং নদীর ধারে থাকি।

(২) চাকরি করি। ৯০৲ টাকা মাহিনা পাই এবং ১০৲ টাকা allowance পাই। একটা ছোটো দোকানও আছে।

---

* শরৎ চন্দ্রের প্রবাস-জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকারের 'ব্রহ্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র' (১৩৩৩-৩৪ সালের 'বাঁশরী' হইতে পুনর্মুদ্রিত, অগ্রহায়ণ ১৩৪১) ও শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সরকারের 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' (জানুয়ারি ১৯৩৯) পুস্তকে মিলিবে। উভয়েই ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎ চন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

দিনগত পাপক্ষয় কোনো মতে কুলাইয়া যায় এই মাত্র। সম্বল কিছুই নাই।

(৩) Heart disease আছে। যে-কোনো মুহূর্ত্তেই—

(৪) পড়িয়াছি বিস্তর। প্রায় কিছুই লিখি নাই। গত দশ বৎসর Physiology, Biology & Psychology এবং কতক History পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।

(৫) আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের manuscript ; 'নারীর ইতিহাস' প্রায় ৪০০।৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম, তাও গেছে।

ইচ্ছা ছিল যা হৌক একটা এ বৎসরে publish করিব। আমার দ্বারা কিছু হয় এ বোধ হয় হইবার নয়, তাই সব পুড়িয়াছে। আবার সুরু করিব এমন উৎসাহ পাই না। 'চরিত্রহীন' ৫০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল। সবই গেল।···

···আর একটা সম্বাদ তোমাকে দিতে বাকী আছে। বছর তিনেক আগে যখন Heart diseaseএর প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন আমি পড়া ছাড়িয়া oil painting সুরু করি। গত তিন বৎসরে অনেকগুলি oil-painting সংগ্রহ হইয়াছিল—তাহাও ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলা বাঁচিয়াছে।

এখন আমার কি করা উচিত যদি বলিয়া দাও ত তোমার কথামত দিনকতক চেষ্টা করিয়া দেখি। Novel, History, Painting—কোন্‌টা? কোন্‌টা আবার সুরু করি বল ত?—তোমার স্নেহের শরৎ।

সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ

শরৎ চন্দ্রের সত্যকার সাহিত্য-জীবনের সূচনা—ব্রহ্মপ্রবাসে। দীর্ঘকাল সাহিত্যসৃষ্টি হইতে বিরত থাকিবার পর ঘটনাচক্রে এই রেঙ্গুনেই আবার তিনি নিয়মিতভাবে লিখিতে সুরু করেন। বিভিন্ন সময়ে বিবৃত আত্মকথায় প্রসঙ্গক্রমে তিনি এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন :—

"এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হ'ল আমার ছাড়াছাড়ি, ভুলেই গেলাম যে, জীবনে একটা ছত্রও কোন দিন লিখেছি। দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে কেন্দ্র ক'রে কি ক'রে নবীন বাংলা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠলো, আমি তার কোন খবরই জানি নে। কবির সঙ্গে কোন দিন ঘনিষ্ঠ হবারও সৌভাগ্য ঘটে নি, তাঁর কাছে ব'সে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পাই নি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন ; এইটা হ'ল বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও সাহিত্য ; এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বই-ই বার বার ক'রে পড়েছি,—কি তার ছন্দ, কটা তার অক্ষর, কা'কে বলে আর্ট, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোন ত্রুটি ঘটেছে কি না,—এ সব বড় কথা কখনো চিন্তাও করি নি—ওসব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের

মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে, আমার ছিল এই পুঁজি।

"একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ ক'রে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হয়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম,—ভয়ের কথা মনেই হ'ল না।" ('জয়ন্তী-উৎসর্গ')

'শ্রীকান্তে'র ইংরেজী অনুবাদের টম্‌সন-লিখিত ভূমিকায় সন্নিবিষ্ট শরৎ চন্দ্রের বিবৃতিটিতেও ইহার উল্লেখ আছে। তিনি যে পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে সাহিত্যানুরাগের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহারও আভাস এই স্মৃতিকথায় পাওয়া যায়। মূল ইংরেজী বিবৃতি ও তাহার বাংলা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

> In Sarat Babu's own words, 'My childhood and youth were passed in great poverty. I received almost no education for want of means. From my father I inherited nothing except, as I believe, his restless spirit and his keen interest in literature. The first made me a tramp and sent me out tramping the whole of India quite early, and the second made me a dreamer all my life. Father was a great scholar, and he had tried his hand at stories and novels, dramas and poems, in short, every branch of literature, but never could finish anything. I have not his work now—somehow it got lost; but I remember poring over those incomplete mss. over and over again in my childhood, and many

a night I kept awake regretting their incompleteness and thinking what might have been their conclusion if finished. Probably this led to my writing short stories when I was barely seventeen. But I soon gave up the habit as useless, and almost forgot in the long years that followed that I could even write a sentence in my boyhood. A mere accident made me start again, after the lapse of about eighteen years. Some of my old acquaintances started a little magazine, but no one of note would condescend to contribute to it, as it was so small and insignificant. When almost hopeless, some of them suddenly remembered me, and after much persuasion they succeeded in extracting from me a promise to write for it. This was in the year 1913. I promised most unwillingly—perhaps only to put them *off* till I had returned to Rangoon and could forget all about it. But sheer volume and force of their letters and telegrams compelled me at last to think seriously about writing again. I sent them a short story, for their magazine *Jamuna*. This became at once extremely popular, and made me famous in one day. Since then I have been writing regularly. In Bengal perhaps I am the only fortunate writer who has not had to struggle."—*Srikanta*: E J. Thompson. 1922.

"আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটে নি। পিতার নিকট হ'তে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাই নি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভ'রে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম।

আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেন নি। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে কেমন ক'রে হারিয়ে গেছে সে কথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কত বার তাঁব অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ ক'বে যান নি এই ব'লে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হ'তে পাবে ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র বজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধ হয় সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে সুরু করি। কিন্তু কিছু দিন বাদে গল্প-রচনা অকেজোর কাজ মনে ক'রে আমি অভ্যাস ছেড়ে দিলাম। তার পর অনেক বৎসর চ'লে গেল। আমি যে কোন কালে একটি লাইনও লিখেছি সে কথাও ভুলে গেলাম।

"আঠার বৎসর পরে একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব দুর্ঘটনারই মত। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিক পত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান্ লেখকদের কেউই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজি হলেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁদের কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার কাছ থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় ক'রে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনেব কথা। আমি নিমরাজি হয়েছিলাম। কোন রকমে তাঁদের হাত থেকে

রেহাই পাবার জন্যেই আমি লেখা দিতেও স্বীকার হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য কোন রকমে একবার রেঙ্গুন পৌছতে পারলেই হয়। কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্য সত্যই আবার কলম ধরতে প্রবোচিত করল। আমি তাঁদের নবপ্রকাশিত 'যমুনা'র জন্য একটি ছোট গল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হ'তে না হ'তেই বাংলার পাঠক-সমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও এক দিনেই নাম ক'রে বসলাম। তার পর আমি অদ্যাবধি নিয়মিতভাবে লিখে আসছি। বাঙ্গলা দেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান্ লেখক যাকে কোন দিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় নি।" ('বাতায়ন,' শরৎ-স্মৃতি-সংখ্যা ১৩৪৪)

শরৎ চন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা—১৩১০ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত 'কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন' পুস্তকের "মন্দির" নামে গল্প। ব্রহ্মদেশে যাত্রার প্রাক্কালে গল্পটি তিনি সম্পর্কীয় মাতুল শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে কুন্তলীন-পুরস্কার-প্রতিযোগিতায় পাঠাইয়াছিলেন (মাঘ ১৩০৯)। বলা বাহুল্য, গল্পটি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ২৫৲ টাকা পুরস্কার লাভ করে। সে-বার পুরস্কৃত রচনাগুলির প্রথম দশটি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন তৎকালীন 'বসুমতী'-সম্পাদক জলধর সেন।

ইহার চারি বৎসর পরে—১৩১৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতী'তে শরৎ চন্দ্রের অপরিণত বয়সের একটি রচনা—'বড়দিদি' উপন্যাস প্রকাশিত হইলেও, মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার প্রকৃত

আবির্ভাব যে ফণীন্দ্রনাথ পাল-সম্পাদিত 'যমুনা' পত্রিকায়, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। উপেন্দ্রনাথ ছিলেন 'যমুনা'-সম্পাদকের বিশিষ্ট বন্ধু; তাঁহারই মধ্যস্থতায় শরৎ চন্দ্র 'যমুনা'য় লিখিতে স্বীকৃত হন। 'যমুনা'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তাঁহার প্রথম রচনা—"বোঝা" নামে অপরিণত বয়সের একটি গল্প (কার্ত্তিক-পৌষ ১৩১৯)।

শরৎ চন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনাগুলি ভাগলপুরে তাঁহার সম্পর্কীয় মাতুলদের নিকট ছিল। এই সময়ে তাঁহারা সেগুলি লোকচক্ষুর গোচরীভূত করিবার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুরেশ সমাজপতি 'সাহিত্যে' শরৎ চন্দ্রের রচনা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা জানাইলে উপেন্দ্রনাথ তাঁহার হস্তে শরৎ চন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনা-সম্বলিত একখানি খাতা দিয়াছিলেন। পাছে পুরাতন রচনা প্রকাশে শরৎ চন্দ্র আপত্তি করেন, সেই আশঙ্কায় উপেন্দ্রনাথ তাঁহাকে পূর্ব্বাহ্নে কিছুই জানান নাই। বলা বাহুল্য, 'সাহিত্যে' "বাল্য-স্মৃতি" (মাঘ ১৩১৯), "কাশীনাথ" (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯), "অনুপমার প্রেম" ও "হরিচরণ" প্রকাশিত হইলে শরৎ চন্দ্র প্রকৃতই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ছেলেবেলার রচনা হুবহু মুদ্রণের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

যাহা হউক, এদিকে ঘন ঘন পত্র-বিনিময়ে 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ ও শরৎ চন্দ্রের মধ্যে যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। 'যমুনা'কে নিয়মিত ভাবে রচনা দিয়া সাহায্য করিবেন—এ প্রতিশ্রুতি শরৎ চন্দ্র একাধিক পত্রে দিয়াছেন। ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৩ তারিখে তিনি রেঙ্গুন হইতে ফণীন্দ্রনাথকে লেখেন :—

"আমি আপনাকে ছেড়ে আর কোথাও যে যাব কিম্বা কোন লোভে যাবার চেষ্টা করব এমন কথা কোন দিন মনেও করবেন না।...আমাব সমস্তটাই দোষে ভরা নয়—।

"আপনি পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করবাব জন্যে চিঠিতে লিখতেন—অন্য কাগজওয়ালাবা আমাকে অনুরোধ কববে। করলেই বা, charity begins at home..."

প্রকৃত পক্ষে ১৩১৯ সালের শেষার্দ্ধ হইতে ১৩২১ সাল পর্য্যন্ত 'যমুনা'র প্রায প্রত্যেক সংখ্যায় শবৎ চন্দ্রেব গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ বা সমালোচনা—কোন-না-কোন বচনা মুদ্রিত হইযাছিল। তিনি বড দিদি অনিলা দেবীর ছদ্ম নামেও কতকগুলি প্রবন্ধ—"নারীব লেখা," "নারীর মূল্য," "কানকাটা" ও "গুরু শিষ্য সম্বাদ" ১৩১৯-২০ সালের 'যমুনা'য় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৩১৯ সালের শেষার্দ্ধ হইতে শরৎ চন্দ্র 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথকে পত্রিকা-সম্পাদনে রীতিমত সাহায্য করিতেন। রেঙ্গুন হইতে 'যমুনা'র জন্য প্রবন্ধ ও গল্পাদি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতেন।

'যমুনা'য় "রামের সুমতি" (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯), "পথ-নির্দ্দেশ" (বৈশাখ ১৩২০) ও "বিন্দুর ছেলে" (শ্রাবণ ১৩২০), এই তিনটি নূতন গল্প উপর্য্যুপরি প্রকাশিত হইবার পর চারি দিকে সাড়া পড়িয়া গেল।

সুদূব প্রবাসে লোকচক্ষুর অন্তরালে দীর্ঘদিন ধরিয়া যখন তাঁহার নীরব-সাহিত্য-সাধনা চলিতেছিল, তখন নিতান্ত অন্তরঙ্গ দু-এক জন ছাড়া আর কেহ তাহা জানিতে পারে নাই। তাই যখন তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব রচনাসম্ভার লইয়া সহসা নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে

আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন বাঙালী পাঠক-সম্প্রদায় চমকিত হইয়া দেখিল—"পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।" শরৎ-সাহিত্যের অভ্রভেদী মহিমা সেদিন সকলকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া দিল।

রচনার জন্য বড় বড় পত্রিকাগুলির উপরোধ-অনুরোধ রেঙ্গুনে শরৎ চন্দ্রের নিকট পৌঁছিতে লাগিল। ১৩২০ সালের আষাঢ় মাসে দ্বিজেন্দ্র-লাল রায়-প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার অন্যতম প্রধান কর্ম্মী, মজঃফরপুরের বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শরৎ চন্দ্র 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের কতকাংশ তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন—অন্তরঙ্গ বন্ধুর আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। অবশ্য প্রথমে 'চরিত্রহীন' 'যমুনা'তেই প্রকাশিত হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত 'ভারতবর্ষে' উহা গৃহীত না হওয়াতে 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। 'চরিত্রহীন' প্রত্যাখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু 'ভারতবর্ষে'র সহিত শরৎ চন্দ্রের সম্পর্ক ছিন্ন হইল না; ১৩২০ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যায় 'বিরাজ বৌ' এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই সকল রচনার বিনিময়ে নিয়মিতভাবে দক্ষিণাপ্রাপ্তি হওয়াতে শরৎ চন্দ্র 'ভারতবর্ষে' রচনা প্রকাশে যেন ক্রমেই অধিকতর উৎসাহী হইয়া উঠিলেন। পাছে তিনি 'যমুনা'র সহিত যোগাযোগ রক্ষা না করেন, এই ভাবিয়া ফণীন্দ্রনাথ রীতিমত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। 'যমুনা'র সহিত শরৎ চন্দ্রের সম্পর্ক যাহাতে দৃঢ়ীভূত হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি এক নূতন ব্যবস্থা করিলেন। ১৩২১ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'যমুনা'র শেষে "সংবাদ"-বিভাগে এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইল :—

"যমুনার পাঠকগণ বোধ হয় শুনিয়া সুখী হইবেন যে, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্ত্তমান মাস হইতে যমুনার সম্পাদন-কার্য্যে যোগদান করিলেন। যমুনার পাঠকগণের নিকটে শরৎবাবু যথেষ্ট পরিচিত—অতএব পরিচিতের নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক বলিয়া মনে করি।"

পরবর্ত্তী শ্রাবণ-সংখ্যা হইতে অন্যতর সম্পাদক-রূপে শরৎ চন্দ্রের নাম 'যমুনা'য় মুদ্রিত হইতে থাকে।* কিন্তু ১৩২১ সালের 'ভারতবর্ষে' শরৎ চন্দ্রের কয়েকটি নূতন রচনা—"পণ্ডিত মশাই" ও আরও তিনটি গল্প প্রকাশিত হইল; এই বৎসরের প্রথমার্দ্ধেই আবার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক 'বিরাজ বৌ' ও 'বিন্দুর ছেলে…' এবং রায় এম. সি. সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক 'পরিণীতা' ও 'পণ্ডিত মশাই' প্রকাশিত হইল। শরৎ চন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পড়িল। ১৩২১ সালের 'যমুনা'য় "চরিত্রহীন" অসমাপ্ত রাখিয়া, তিনি 'যমুনা'র সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। অতঃপর শরৎ চন্দ্রের রচনার জন্য প্রধানতঃ 'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠাই অনুসন্ধান করিতে হইবে।

---

* পরবর্ত্তী কালে যুগ্ম-সম্পাদকরূপে আর একখানি পত্রিকার সহিত তাঁহার নাম সংযুক্ত দেখা যায়; উহা—'রূপ ও রঙ্গ' নামে সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা, প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ১৮ আশ্বিন ১৩৩১ (৪ অক্টোবর ১৯২৪)। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র ইহার অন্যতর সম্পাদক ছিলেন।

স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন

ব্রহ্মদেশে শরৎ চন্দ্রের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছিল; তাঁহার পক্ষে সে দেশ ত্যাগ করা অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। তিনি 'ভারতবর্ষে'র স্বত্বাধিকারী শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে রেঙ্গুন হইতে লিখিলেন:—

> "ভায়া, আমি এবার বড়ই পড়িয়াছি। সুদূর হইতে প্রমথ ভায়ার বাতাস লাগিল না কি হইল বুঝিতে পারিতেছি না। এ আবার আরও খারাপ। এ শুনি বর্ম্মাদেশের ব্যারাম—দেশ না ছাড়িলে কোন দিন এও ছাড়ে না। তাই দুয়ের এক বোধ করি অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছে। কি জানি, ভগবান্‌ই জানেন। ভয় হয় হয়ত বা, চিরজীবন পঙ্গু হইয়াই বা যাইব।" (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬)

এই সময়ে মাসিক এক শত টাকা আয়ের ভরসা দিয়া হরিদাস-বাবু শরৎ চন্দ্রকে কলিকাতা চলিয়া আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। শরৎ চন্দ্র অকূলে কূল পাইয়া এক বৎসরের ছুটিতে কবিরাজী চিকিৎসার জন্য কলিকাতা ফিরিতে মনস্থ করিলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তিনি রেঙ্গুন ত্যাগ করেন।

রেঙ্গুন হইতে ফিরিয়া শরৎ চন্দ্র বাজে-শিবপুরে অবস্থিতি করিতেন। এই সময় হইতে তাঁহার সাহিত্য-জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল, উত্তরোত্তর তাঁহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, ক্রমে অপরাজেয় কথাশিল্পী-রূপে বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। সভা-সমিতিতে যোগদান, রচনার জন্য উপরোধ-

অনুরোধ, দর্শনার্থীদের ভিড় ইত্যাদিতে অতিষ্ঠ হইয়া শহরের কোলাহল হইতে দূরে থাকিবার অভিপ্রায়ে তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এগার শত টাকা দিয়া হাবড়া জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান পানিত্রাস গ্রামে, বড় দিদি অনিলা দেবীর বাটীর সন্নিকটে, এক খণ্ড জমি ক্রয় করিয়া গৃহনির্ম্মাণ করেন (ইং ১৯২৫)। ইহার বছর-দশেক পরে তিনি জীবনসঙ্গিনী হিরণ্ময়ী দেবীর ইচ্ছায় কলিকাতায় অশ্বিনী দত্ত রোডেও একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (জুলাই ১৯৩৪)।

রূপনারায়ণের তীরস্থ নিভৃত পল্লী-নিকেতনেই তিনি বৎসরের অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। সেখানকার শান্ত পরিবেশে সরলপ্রাণ দীনদরিদ্র পল্লীবাসীদের সাহচর্য্যে তাঁহার মন শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিত। কলিকাতা হইতে সাহিত্যিক ও অনুরাগিবৃন্দ প্রায়ই তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিবার জন্য সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতেন। এমনিভাবে শরৎ চন্দ্রের পানিত্রাসের পল্লীভবন সাহিত্যিক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।

শরৎ চন্দ্র সারা জীবনই ছিলেন সঙ্গীতের অনুরাগী। সঙ্গীত-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি পানিত্রাসের পল্লীনিবাসে বেতারযন্ত্রের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেখানে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় বেতার-সঙ্গীত শুনিয়া তিনি অবসর বিনোদন করিতেন। পল্লী-প্রকৃতির পটভূমিকায় বেতার-বাহিত সঙ্গীত শ্রবণের বড একটি মনোরম চিত্র তাঁহার তূলিকায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন :—

"শহর হইতে দূরে গ্রামের মধ্যে আমার বাস। অতীতের নানাপ্রকার আমোদ ও আনন্দের প্রাত্যহিক আয়োজন গ্রামে আর

নাই, পল্লী এখন নির্জীব নিরানন্দ। কর্ম্মক্লান্ত দিনের কত সন্ধ্যায় এই নিঃসঙ্গ পল্লীভবনে বেতারের জন্য উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করিয়াছি। শ্রাবণের ঘন মেঘে চারি দিক আচ্ছন্ন হইয়া আসে, কর্দ্দমাক্ত জনহীন গ্রাম্যপথ নিতান্ত দুর্গম, নিবিড় অন্ধকার ভারের মত বুকের 'পরে চাপিয়া বসে, তখন বেতার-বাহিত গানের পালায় মনে হয় যেন দূরে থাকিয়াও আসরের ভাগ পাইতেছি।

"আবার কোনোদিন ক্ষান্তবর্ষণ আকাশে লঘু মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো দেখা দেয়, বর্ষার সুবিস্তীর্ণ নদী-জলে মলিন জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়ে, আমি তখন প্রাঙ্গণের একান্তে নদী-তটে আরাম-কেদারায় চোখ বুজিয়া বসি, তামাকের ধুঁয়াব সঙ্গে মিশিয়া বেতার বাঁশীর সুর যেন মায়াজাল রচনা করে। দু-এক জন করিয়া প্রতিবেশী জুটিতে থাকে, ঘাটে বাঁধা নৌকায দূরের যাত্রী, কৌতূহলী দাঁড়ী-মাঝির দল নিঃশব্দে আসিয়া ঘিরিয়া বসে, আবার শেষ হইলে পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া যে যাহাব আলয়ে চলিয়া যায়। এই আনন্দের অংশ আমি পাই।"

সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে শরৎ চন্দ্রের বক্তব্য

শরৎ-সাহিত্য বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তাঁহাকে কম দুঃখ-দুর্গতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সকল সম্প্রদায়ের নর-নারীর সংস্পর্শে আসিবার এবং তাহাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের ঘনিষ্ঠ

পরিচয় লাভ করিবার সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বাল্যবন্ধু ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একবার তিনি বলিয়াছিলেন—

"চারু, আমার মতো ক'রে তোমাদের যদি উপন্যাস রচনা করতে হ'ত তাহ'লে তোমরা উপন্যাস লিখ্‌তেই পারতে না। এমন দিন গেছে, যখন দু-তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকেছি। কাঁধে গামছা ফেলে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। কত বাড়ীতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে—তারা ভদ্রলোক! কত হাড়ী-বাগ্দীর বাড়ীতে আহার করেছি। গ্রামের সকলের সঙ্গে মিশেছি তাদের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে তাদের মুখ থেকে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাহিনী জেনে নিয়েছি। তার পর খুব ভাল ক'রে দেখে নিয়েছি পল্লীগ্রাম ও পল্লীসমাজ। তা ছাড়া আমার উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র এবং ঘটনা আমার স্বচক্ষে দেখা।" ("শরৎস্মৃতি" : 'প্রবাসী', কার্ত্তিক ১৩৪৫)

সমাজের অত্যাচরিত ভাগ্যহত বঞ্চিত নর-নারীর যে ব্যথা-বেদনা *শরৎ চন্দ্র মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির মূল উৎস। শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে এই অনুযোগ কেহ কেহ করিয়া থাকেন যে, তাহার বিষয়বস্তু অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ; সৃষ্ট চরিত্রগুলিও একই ছাঁচে গঠিত। এ অভিযোগ শরৎ চন্দ্র অস্বীকার করেন নাই; ইহার হেতু সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :—

"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের

কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,—এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম ? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্ব্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে। সংসারে সৌন্দর্য্যে সম্পদে ভরা বসন্ত আসে জানি; আনে সঙ্গে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মল্লিকা-মালতী-জাতী-যূথি, আনে গন্ধ-ব্যাকুল দক্ষিণা পবন; কিন্তু যে আবেষ্টনে দৃষ্টি আমার আবদ্ধ রয়ে গেল তার ভিতরে ওরা দেখা দিলে না। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘট্‌লো না। সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে। কিন্তু, অন্তরে যাকে পাই নি, শ্রুতি-মধুর শব্দ-রাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকেই পেয়েছি ব'লে প্রকাশ করবার ধৃষ্টতাও আমি করি নি। এম্‌নি আরও অনেক কিছুই—এ জীবনে যাঁদের তত্ত্ব খুঁজে মেলে নি স্পর্দ্ধিত অবিনয়ে মর্য্যাদা তাঁদের ক্ষুণ্ণ করার অপরাধও আমার নেই। তাই সাহিত্য-সাধনার বিষয়-বস্তু ও বক্তব্য আমার বিস্তৃত ও ব্যাপক নয়, তারা সঙ্কীর্ণ, স্বল্পপরিসরবদ্ধ। তবুও এটুকু দাবী করি, অসত্যে অনুরঞ্জিত ক'রে তাদের আজও আমি সত্যভ্রষ্ট করি নি।" (৫৭ জন্মদিন উপলক্ষে টাউন-হলে স্বদেশবাসীর অভিনন্দনের প্রতিভাষণ)

* সমাজের সকল স্তরের নরনারীর সঙ্গে মিশিয়া শরৎ চন্দ্রের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, মানুষের আসল সত্তা তাহার দোষ-ত্রুটি দুর্ব্বলতা-অপরাধ ইত্যাদি হইতে ঢের বড়। সমাজ-পরিত্যক্ত অতি সাধারণ মানুষের মধ্যেও তিনি মনুষ্যত্বের বিরাট্ মহিমাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বহু আয়াসে লব্ধ অভিজ্ঞতাকেই তিনি তাঁহার সাহিত্যে রূপ দান করিবার প্রয়াস পান, তাহাতে প্রচলিত সংস্কারে আঘাত লাগিতে পারে বা রুচিবাগীশদের উৎকট নৈতিক বোধ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এ কথা ভাবিয়া সত্যের প্রকাশে বিরত হন নাই। *

কিন্তু তথাকথিত সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষকগণ তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুগামীদের ক্ষমা করেন নাই। শরৎ-সাহিত্য লইয়া সেদিন সাহিত্যক্ষেত্রে তুমুল বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল। শরৎ চন্দ্রের সাহিত্য অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট, তাহাতে দুর্নীতির সমর্থন আছে, পাপের চিত্র এবং পাপীর চরিত্রকে তিনি মনোহর করিয়া আঁকিয়াছেন,—এরূপ অভিযোগ কেহ কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থাপন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন প্রবন্ধে, অভিভাষণে ও পত্রাদিতে শরৎ চন্দ্র এই অভিযোগ খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত রচনাংশ-সমূহ হইতে এ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে :—

"...আধুনিক ঔপন্যাসিকদের বিরুদ্ধে এই নালিশ যে, ইহারা বঙ্কিমের ভাষা, ভাব, ধরণ-ধারণ, চরিত্র-সৃষ্টি কিছুই আর অনুসরণ করিতেছে না, অতএব অপরাধ ইহাদের অমার্জ্জনীয়, ইহার জবাব দেওয়া একটা প্রয়োজন! আমি বয়সে যদিচ প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু সাহিত্য-ব্যবসায় আজও আমার বছর দশেক উত্তীর্ণ হয় নাই।

অতএব আধুনিকদের পক্ষ হইতে উত্তর দিই ত বোধ করি অন্যায় হইবে না। অভিযোগ ইহাদের সত্য, আমি তাহা অকপটে স্বীকার করিতেছি, *বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আমাদের কাহারও অপেক্ষা কম নয়, এবং সেই শ্রদ্ধাব জোরেই আমরা তাঁহার ভাষা, ভাব পরিত্যাগ কবিয়া আগে চলিতে দ্বিধা বোধ কবি নাই। মিথ্যা ভক্তির মোহে আমরা যদি তাঁহাব সেই ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার বস্তুই শুধু ধরিয়া পড়িয়া থাকিতাম, ত কেবলমাত্র গতির অভাবেই বাঙ্গলা সাহিত্য আজ মবিত। *দেশেব কল্যাণে একদিন তিনি নিজে প্রচলিত ভাষা ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া পা বাড়াইতে ইতস্ততঃ করেন নাই, তাঁহার সেই নির্ভীক কর্ত্তব্য-বোধের দৃষ্টান্তকেই আজ যদি আমরা তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাহিত্য-সৃষ্টির চেয়েও বড করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, ত সে তাঁহার মর্য্যাদা হানি করা নয়। এবং সত্যই যদি তাঁহার ভাষা, ধরণ-ধারণ, চরিত্র-সৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তই আমরা আজ ত্যাগ করিয়া গিয়া থাকি ত দুঃখ করিবারও কিছু নাই।"—"আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ।"

* * *

"...সুদূর প্রবাসে কেরাণীগিরি করতাম, ঘটনাচক্রে বছর দশেক হ'ল এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে পড়েছি। খান. কয়েক বই লিখেছি, কারও ভাল লেগেছে, অনেকেরই লাগে নি,—পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা ভারি ভারি কেতাব থেকে শক্ত শক্ত অকাট্য নজির তুলে সপ্রমাণ করেছেন যে, বাঙ্গলা ভাষার আমি একেবারে সর্ব্বনাশ ক'রে দিয়েছি। এত সত্বর এত বড দুষ্কার্য্য কি ক'রে করলাম তাও

আমি বিদিত নই, কি-ই বা এর কৈফিয়ৎ সেও আমার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।···

"···আমার নিজের পেশা উপন্যাস-সাহিত্য, সুতরাং এই সাহিত্যের দু'একটা কথা বলা বোধ করি নিতান্তই অনধিকার চর্চ্চা ব'লে গণ্য হবে না। যাঁরা আমার নমস্য আমার গুরুপদবাচ্য তাঁদের লেখা থেকে এক আধটা উদাহরণ দিলে যদি বা একটু বিরুদ্ধ মত থাকে, আশা করি আপনাদের কেহই তাকে অসম্মান বা অশ্রদ্ধা ব'লে ভুল করবেন না। আমার সাহিত্যিক জীবনের পরিণতির প্রসঙ্গে এর প্রয়োজনও আছে। *গোটা দুই শব্দ আজকাল প্রায় শোনা যায়, Idealistic and Realistic. আমি না কি এই শেষ সম্প্রদায়ের লেখক। এই দুর্নামই আমার সবচেয়ে বেশী। অথচ, কি ক'রে যে এই দুটোকে ভাগ ক'রে লেখা যায়, আমার অজ্ঞাত। Art জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি, সে nature নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে,—এবং অনেক নোঙ্‌রা জিনিসই ঘটে,—তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। প্রকৃতি বা স্বভাবের হুবহু নকল করা photography হ'তে পারে, কিন্তু সে কি ছবি হবে? দৈনিক খবরের কাগজে অনেক কিছু রোমহর্ষণ ভয়ানক ঘটনা ছাপা থাকে, সে কি সাহিত্য? চরিত্র-সৃষ্টি কি এতই সহজ?···আমি ত জানি কি ক'রে আমার চরিত্রগুলি গ'ড়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করছি নে, কিন্তু বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত ব্যথা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফোটে, সে আর কেউ না

জানে তা আমি ত জানি। সুনীতি দুর্নীতির স্থান এর মধ্যে আছে, কিন্তু বিবাদ করবার জায়গা এতে নেই,—এ বস্তু এদের অনেক উচ্চে। এদের গণ্ডগোল করতে দিলে এমন গোলযোগ বাধবে যে, কাল তাকে ক্ষমা করবে না। নীতি-পুস্তক হবে, কিন্তু সাহিত্য হবে না। পুণ্যের জয় এবং পাপের ক্ষয়, তাও হবে, কিন্তু কাব্যসৃষ্টি হবে না।

✦"আমাব মনে আছে, ছেলেবেলায় 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তার পরে পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়ীতে বোঝাই হয়ে লাস চালান গেল। অর্থাৎ হিন্দুত্বের দিক্ দিয়ে পাপের পরিণামের বাকী কিছু আর রইল না! ভালই হ'ল। হিন্দু সমাজও পাপীর শাস্তিতে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কিন্তু আর একটা দিক্? যেটা এদের চেয়ে পুরাতন, এদের চেয়ে সনাতন,—নর-নারীর হৃদয়ের গভীরতম, গূঢ়তম প্রেম?—আমার আজও যেন মনে হয়, দুঃখে সমবেদনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দুই চোখ অশ্রুপরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, মনে হয়, তাঁর কবিচিত্ত যেন তাঁরই সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা ক'রে মরেছে। ✦

✦ "…শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় আমার 'পল্লী-সমাজে'র বিধবা রমাকে তাঁর 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' পুস্তকে বিদ্রূপ ক'রে বলেছেন, "তুমি ঠাকুরাণী বুদ্ধিমতী না? বুদ্ধিবলে তোমার পিতার জমিদারী শাসন করিতে পারিলে, আর তুমিই কি না তোমার

বাল্যসখা পরপুরুষ রমেশকে ভালবাসিয়া ফেলিলে? এই তোমার বুদ্ধি? ছিঃ।" এ ধিক্কার artএর নয়, এ ধিক্কার সমাজের, এ ধিক্কার নীতির অনুশাসন। এদের মানদণ্ড এক নয়, বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে এক করার প্রয়াসের মধ্যেই যত গলদ, যত বিরোধের উৎপত্তি।...

"ভাল মন্দ সংসারে চিরদিনই আছে,—ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ বলায় কোন artই কোন দিন আপত্তি করে না। কিন্তু দুনিয়ায় যা কিছু সত্যই ঘটে, নির্ব্বিচারে তাকেই সাহিত্যের উপকরণ করলে সত্য হ'তে পারে, কিন্তু সত্য-সাহিত্য হয় না।

"অর্থাৎ, যা কিছু ঘটে তার নিখুঁত ছবিকেও আমি যেমন সাহিত্য-বস্তু বলি নে, তেম্‌নি যা ঘটে না, অথচ, সমাজ বা প্রচলিত নীতির দিক্ দিয়ে ঘটলে ভাল হয়, কল্পনার মধ্য দিয়ে তাব উচ্ছৃঙ্খল গতিতেও সাহিত্যের ঢের বেশী বিড়ম্বনা ঘটে।

"আমার অবসর অল্প, বক্তব্য বস্তুকে আমি পবিস্ফুট করতে পারি নি, এ আমি জানি, কিন্তু আধুনিক-সাহিত্য রচনায় সমাজের এক শ্রেণীর শুভাকাঙ্ক্ষীদের মনের মধ্যে কোথায় অত্যন্ত ক্ষোভ ও ক্রোধের উদয় হয়েছে, বিরোধের আরম্ভ যে কোন্‌খানে, সে দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করাটুকু বোধ করি আমাদের সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু আলোচনা ঘোরতর ক'রে তোলবার আমার প্রবৃত্তি নেই, সময় নেই, শক্তিও নেই, শুধু অশেষ শ্রদ্ধাভাজন আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যাচার্য্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার পথে কোথায় বাধা পেয়ে আমরা যে অন্য পথে চলতে বাধ্য হয়ে পড়েছি, সেই

আভাসটুকু মাত্র আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করলাম।—”
“সাহিত্য ও নীতি।”

* * *

“…‘পল্লী-সমাজ’ ব’লে আমার একখানা ছোট বই আছে। তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল ব’লে আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও করেছিলেন যে, এত বড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা কেউ আর থাকবে না। মরণ বাঁচনের কথা বলা যায় না, প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিক্‌ও ত আছে। ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয়, হিন্দু-সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই। রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালে, কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দু-সমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হ’ল এই যে, এত বড় দুটি মহাপ্রাণ নর-নারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হয়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্ত্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি, ত তার বেশী আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা বর্ত্তমানে ব্যর্থ হ’তে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দ্দোষীর এত বড় শাস্তিভোগ একদিন

কিছুতেই মঞ্জুর হবে না, এ কথা আমি নিশ্চয় জানি।* এ বিশ্বাস না থাকলে সাহিত্যসেবীর কলম সেইখানেই সে দিন বন্ধ হয়ে যেত।

"আগেকার দিনে বাঙ্গলা সাহিত্যেব বিরুদ্ধে আব যা নালিশই থাক্, দুর্নীতির নালিশ ছিল না, ওটা বোধ করি তখনও খেয়াল হয় নি। এটা এসেছে হালে। তাঁরা বলেন, আধুনিক সাহিত্যের সবচেয়ে বড় অপরাধই এই যে, তার নর-নারীর প্রেমের বিবরণ অধিকাংশই দুর্নীতিমূলক, এবং প্রেমেরই ছড়াছড়ি। অর্থাৎ নানা দিক্ দিয়া এই জিনিসটাই যেন মূলতঃ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তু হয়ে উঠেছে।

"নেহাৎ মিথ্যা বলেন না। কিন্তু তার দুই একটা ছোটখাট কারণ থাক্‌লেও মূল কারণটাই আপনাদের কাছে বিবৃত করতে চাই।* সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা ব'লে মানি নে। বহু দিনের পুঞ্জীভূত, নর-নারীর বহু মিথ্যা, বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিশে আছে। মানুষের খাওয়া-পরা থাকার মধ্যে এর শাসনদণ্ড অতি সতর্ক নয়, কিন্তু এর একান্ত নির্দ্দয় মূর্ত্তি দেখা দেয় কেবল নর-নারীর ভালবাসার বেলায়। সামাজিক উৎপীড়ন সবচেয়ে সইতে হয় মানুষকে এইখানে। মানুষ একে ভয় করে, এর বশ্যতা একান্তভাবে স্বীকার করে, দীর্ঘদিনের এই স্তূপীকৃত ভয়ের সমষ্টিই পরিশেষে বিধিবদ্ধ আইন হয়ে উঠে, এর থেকে রেহাই দিতে সমাজ কাউকে চায় না। পুরুষের তত মুস্কিল নেই, তার ফাঁকি দেবার রাস্তা খোলা আছে,

কিন্তু কোথাও কোন সূত্রেই যার নিষ্কৃতির পথ নেই, সে শুধু নারী। তাই সতীত্বের মহিমা প্রচারই হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ সাহিত্য। কিন্তু এই এক ভরসা, propaganda চালানোর কাজটাকেই নবীন সাহিত্যিক যদি তার সাহিত্য-সাধনাব সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ব'লে গ্রহণ করতে না পেরে থাকে, ত তার কুৎসা করা চলে না; কিন্তু কৈফিয়তের মধ্যেও যে তাব যথার্থ চিন্তার বস্তু বহু নিহিত আছে, এ সত্যও অস্বীকার করা যায না।···

"পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড, এই কথাটা একদিন আমি বলেছিলাম। কথাটাকে যৎপরোনাস্তি নোঙ্‌বা ক'রে তুলে আমাব বিরুদ্ধে গালি-গালাজের আব সীমা বইল না।· মানুষ হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল। অত্যন্ত সতী নারীকে আমি চুরি, জুযাচুরি, জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখেছি এবং ঠিক এর উল্টাটা দেখাও আমার ভাগ্যে ঘটেছে। এ সত্য নীতিপুস্তকে স্বীকার করার আবশ্যকতা নেই। কিন্তু বুড়ো ছেলেমেয়েকে গল্পচ্ছলে যদি এই নীতিকথা শেখানোর ভার সাহিত্যকে নিতে হয়, ত আমি বলি, সাহিত্য না থাকাই ভাল। সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়। পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, এ কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায়, ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?···এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে রুষ-সাহিত্যের মত যে দিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ-বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সে

দিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান ক'রে নিতে পারবে।"—"সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি।"

* * *

"...নানা অবস্থাবিপর্য্যয়ে একদিন নানা ব্যক্তির সংস্রবে আসতে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি যে কিছু পৌছায় নি তা নয়, কিন্তু সে দিন দেখা যাদের পেয়েছিলাম, তারা সকল ক্ষতিই আমার পরিপূর্ণ ক'রে দিয়েছে। তারা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছে, ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্ম্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ—তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য-রচনায় তাকে যেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক্, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়, আমার লেখা কোন দিন যেন না এত বড় অন্যায় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকেই তা আমার অপরাধ ব'লে গণ্য করেছেন, এবং যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা পেয়েছি, সে আমার এই অপরাধ। পাপীর চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হয়ে উঠেছে, আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সবচেয়ে বড় এই অভিযোগ।

"এ ভাল কি মন্দ আমি জানি নে, এতে মানবের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ অধিক হয় কি না, এ বিচার ক'রেও দেখি নি, শুধু সে দিন যাকে সত্য ব'লে অনুভব করেছিলাম, তাকেই অকপটে প্রকাশ করেছি। এ সত্য চিরন্তন ও শাশ্বত কি না, এ

চিন্তা আমার নয়, কাল যদি সে মিথ্যা হয়েও যায়—তা নিয়ে কারো সঙ্গে আমি বিবাদ করতে যাব না।···সৃষ্টির কালটাই হ'ল যৌবনকাল—কি প্রজা-সৃষ্টির দিক্ দিয়ে, কি সাহিত্য-সৃষ্টির দিক্ দিয়ে। এই বয়স অতিক্রম ক'রে মানুষের দূরের দৃষ্টি হয়ত ভীষণতর হয়, কিন্তু কাছের দৃষ্টি তেমনি ঝাপসা হয়ে আসে। প্রবীণতার পাকা বুদ্ধি দিয়ে তখন নীতিপূর্ণ কল্যাণকর বই লেখা চলে, কিন্তু আত্মভোলা যৌবনের প্রস্রবণ বেয়ে যে রসের বস্তু ঝ'রে পড়ে, তার উৎস-মুখ রুদ্ধ হয়ে যায়। আজ তিপ্পান্ন বছরে পা দিয়ে আমার এই কথাটাই আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই,—অতঃপর রসের পরিবেশনে ত্রুটি যদি আপনাদের চোখে পড়ে, নিশ্চয় জানবেন—তার সকল অপরাধ আমার এই তিপ্পান্ন বছরের।"—৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষে অভিভাষণ।

* * *

"'চরিত্রহীন' এর নাম!—তখন পাঠককে ত পূর্ব্বাহ্নেই আভাস দিয়াছি—এটা সুনীতিসঞ্চারিণী সভার জন্যও নয়, স্কুলপাঠ্যও নয়। টলষ্টয়ের 'রিসরেক্‌শন্' তাহারা একবার যদি পড়ে তাহা হইলে চরিত্রহীন সম্বন্ধে কিছুই বলিবার থাকিবে না। তা ছাড়া ভাল বই, যাহা art হিসাবে—Psychology হিসাবে বড় বই, তাহাতে দুশ্চরিত্রের অবতারণা থাকিবেই থাকিবে। কৃষ্ণকান্তের উইলে নাই?···টাকাই সব নয়, দেশের কাজ করা দরকার; পাঁচ জনকে যদি বাস্তবিক শিখাইতে পারা যায়, গোঁড়ামির অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে কথা বলা যায়, তার চেয়ে আনন্দের বস্তু আর কি আছে?

আজ লোকে আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের কথা না শুনিতে পারে, কিন্তু এক দিন শুনিবেই।...একদিন এই সঙ্কল্প করিয়াই আমি সাহিত্যসভা গড়িয়াছিলাম, আজ আমার সে সভাও নাই, সে জোরও নাই।" ('শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী,' পৃ. ৪০)

* * *

"বু—ব লিখেছে সাবিত্রীর মত মেসের ঝি থাকলে আমরা মেসে প'ড়েই থাকতুম। কিন্তু মেসে প'ড়ে থাকলেই হয় না—সতীশ হওয়া চাই নইলে সাবিত্রীর হৃদয় জয় করা যায় না। সারা জীবন মেসে কাটালেও না, তা ছাড়া ছেলেটি একটু বোঝে না যে সাবিত্রী সত্যিই ঝি-শ্রেণীর মেয়ে নয়। পুরাণে আছে লক্ষ্মী দেবীও দায়ে প'ড়ে একবার এক ব্রাহ্মণ-গৃহে দাসীবৃত্তি করেছিলেন। পঞ্চ পাণ্ডবের অর্জ্জুন উত্তরাকে যখন নাচগান শেখাতেন তখন তাঁর কথা শুনে এ কথা বলা চলে না যে এ রকম ভেড়ুয়া পেলে সব মেয়েই নাচগান শেখার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠতো। *সকল সম্প্রদায়ের মতো বেশ্যাদের মধ্যেও উঁচু নীচু আছে। বেশ্যার কাছে যে-বেশ্যা দাসী হয়ে আছে তার চাল-চলন এবং তার মনিবের চাল-চলন এক না হ'তেও পারে। এদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে আট আনা এক টাকা খরচ করলেই চলে কিন্তু ওদের জানবার অনেক ব্যয়। সহজে তাদের দেখা মেলে না, তারা রঙ মেখে বারান্দায় মোড়া পেতে বসে না...। যারা নির্বিচারে স্ত্রী-জাতির গ্লানি প্রচার করাটাকেই realism ভাবে তাদের idealism ত নেই-ই realismও নেই। আছে শুধু অবিনয় ও মিথ্যে স্পর্দ্ধা—না-জানার

অহমিকা। মেয়েদের বিরুদ্ধে কোঁদল করার স্পিরিট থেকে কথনো সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।"*('শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী,' পৃ. ১২৫-৭)

"আমি আজ পর্য্যন্ত যা কিছু লিখেছি তার প্রত্যেকটি কথা ওজন ক'রে লিখেছি, আমি কথনো ফাঁকি দিযে লিখি না, আমার কোনো লেখায় একটি কথাও আমি অযথা লিখি না—একটি কথাও বদ্‌লাতে পারি না।*আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে, আমি পাপের বিকৃত জঘন্য রূপ দেখাবার জন্যেই পাপচিত্র এঁকেছি, সাহিত্যের রুচির বা নীতির কোনো আইন কথনো অমান্য করি নি। হয়ত কোনো কোনো জায়গায় আর-এক পা বাড়ালেই সেটা দুর্নীতিমূলক সাহিত্য হয়ে পড়ত, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি কোথায়ও সেই সীমা লঙ্ঘন ক'রে যাই নি।" *('শনিবারের চিঠি,' ভাদ্র ১৩৩৭, পৃ.৭)

শরৎ-সাহিত্য যে বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত, তাঁহার এই সমস্ত উক্তি হইতে তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ সংসার ও সমাজের যে দিক্‌টা নিজে তিনি দেখেন নাই, বা যাহার স্বরূপ উপলব্ধি করেন নাই, তাহাকে সাহিত্যে রূপ দান করিবার প্রয়াস হইতে তিনি বিরত ছিলেন। ভাগলপুরে মাতুলালয়ে একান্নবর্ত্তী বৃহৎ পরিবারে মানুষ হওয়াতে যে বহু বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁহার হইয়াছিল, তাহা তাঁহার গল্প-উপন্যাসের অনেক পাত্র-পাত্রীর চরিত্রে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। উপেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "তাঁর গল্প-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের অবয়বে হঠাৎ এক এক সময়ে দেখতে পাই প্রাচীন গাঙ্গুলী-পরিবারের কর্ত্তা-গৃহিণী বউ-ঝিয়ের সুস্পষ্ট

ঝিলিক।" মাতুলালয়ের অনেক ঘটনাকে তিনি বাস্তবে কল্পনায় মিশাইয়া সাহিত্যে রূপায়িত করিয়াছেন। এমন কি, মাতুলদের নামে তিনি উপন্যাসের অনেক পাত্র-পাত্রীর নামকরণ পর্য্যন্ত করিয়াছেন—যেমন, 'বড়দিদি'তে সুরেন্দ্র, 'পরিণীতা'য় গিরীন্দ্র, 'চরিত্রহীনে' উপেন্দ্র (উপীন) এবং 'বিপ্রদাসে' বিপ্রদাস। শরৎ-সাহিত্যে পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে স্নেহ প্রেম ভালবাসা হিংসা বিদ্বেষের যে চিত্র পাওয়া যায়, বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই তাহা এমন সত্য ও সজীব।

রচনা-কৌশল সম্বন্ধে শিল্পী শরৎ চন্দ্র

সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে লিপি-সংযম যে একান্ত প্রয়োজন, শরৎ চন্দ্র সে বিষয়ে সম্যক্ অবহিত ছিলেন। রচনা-কৌশল সম্বন্ধে তিনি কিরূপ ধারণা পোষণ করিতেন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে লিখিত চিঠিপত্র হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। 'শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী' পুস্তক হইতে এ সম্বন্ধে কয়েকটি পত্রাংশ উদ্ধৃত হইল :—

> আরম্ভটাই সকলের চেয়ে শক্ত, এইটার উপরেই প্রায় সমস্ত বইটা নির্ভর করে।··· ···
>
> গল্প লিখিতে গিয়া প্রথমে যাহাকে প্লট বলে তাহার প্রতিই অতিরিক্ত মন দেবার দরকার নাই। যে যে লোক তোমার বইয়ে থাকিবে প্রথমে তাহাদের সমস্ত চরিত্রটা নিজের মধ্যে

স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। এই ধরো যাঁকে খুব জানো, তোমার বাবা কিম্বা তোমার স্বামী। তার পরে এই দুটি চরিত্র তাঁদের দোষগুণ লইয়া কোন্ কোন্ ব্যাপারের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারেন তাহাই ঠিক করিয়া লইতে হয়। ধরো তোমার বাবা তাঁর কাজের মধ্যে, তাঁর মামলা মোকদ্দমার মধ্যে, তোমার স্বামী তাঁর বন্ধুর চাকরির মধ্যে, উদারতার মধ্যে বা ত্যাগের মধ্যে ভালো করিয়া সম্পূর্ণ হইতে পারেন,—তখনই কেবল গল্প বাঁধিবার চেষ্টা করা উচিত। নইলে প্রথমেই গল্পের প্লট লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যক হয় না। যাহার হয় তাহার গল্প ব্যর্থ হইয়া যায়।

* * *

সাহিত্য রচনা করবার কৌশলটাও আয়ত্ত করা চাই, নইলে শুধু শুধু ত নিজের অনুভূতি মাত্র সম্বল ক'রেই কাজ হবে না।··· কতটুকু লিখতে হয়, কোন্‌টা বাদ দিতে হয়, কোন্‌টা চেপে যেতে হয়

> "ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
> রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

এত বড সত্য কথা আর নেই। দিদি, যত ঘটনা ঘটে তার সবটুকু ত লিখতে নেই—কতক পরিস্ফুট ক'রে বলা, কতক ইঙ্গিতে সারা, কতক পাঠকের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া।

* * *

রচনার যে শিল্প বল, কৌশল বল, টেক্‌নিক বল—এই বস্তুটা যা আছে তা আর একটুখানি যত্ন নিয়ে তোমাকে আয়ত্ত করতে হবে। কেবল লেখাই ত নয় ভাই, না-লেখার বিদ্যেটাও যে শিখতে হয়। তখন উচ্ছ্বসিত হৃদয় যে কথা শতমুখে বলতে চায়, তাই শান্ত সংযত হয়ে একটুখানি গভীর ইঙ্গিতেই সম্পূর্ণ হয়ে আসে। মাঝে মাঝে এ চেতনা তোমার এসেছে, আবার মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হয়েছ। অর্থাৎ, পাঠকের দল এমনি কুড়ে যে তারা শত যোজন সিঁড়ি ভেঙে স্বর্গে যেতেও চায় না যদি একটুখানি মাত্র ডিগবাজী খেয়ে নরকে গিয়েও পৌঁছতে পারে। এই হদিসটুকুই মনে রাখা রচনার সবচেয়ে বড় কৌশল।

* * *

ইহারা মনে করে সব কথাই বুঝি বলা চাই-ই। যা দেখে, যা শোনে, যা হয়, মনে করে সমস্তই লোককে দেখান শোনান দরকার। যারা ছবি আঁকিতে জানে না তারা যেমন তুলি হাতে করিয়া মনে করে, যা চোখের সামনে দেখি সবই আঁকিয়া ফেলি। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে-ই শেষে টের পায়—না, তা নয়। অনেক বড় জিনিস বাদ দিতে হয়, অনেক বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে হয়—তবে ছবি হয়। বলা বা আঁকার চেয়ে না-বলা, না-আঁকা ঢের শক্ত। অনেক আত্মসংযম অনেক লোভ দমন করিতে হয়, তবেই সত্যিকারের বলা এবং আঁকা হয়।

...বইটা ছোট করার দরকার গোড়ার দিকে। এটা হচ্ছে একটা কৌশল্। পড়ার interest গোড়ার দিকে অন্ততঃ যেন ক্লান্ত হয়ে না পড়ে।

* * *

Dialogue ছোট হওয়া চাই, মিষ্টি হওয়া চাই—কিছুতেই না মনে হয় এ প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা অক্ষরও বেশী বলেছে। এই হ'ল artistic formএর ভিতরের রহস্য। প্রথমে হয়ত মনে হবে আমার সব কথা বলা হ'ল না, পাঠকেরা বোধ হয় ঠিক বক্তব্যটি ধরতে পারবে না, কিন্তু এইখানেই হয় লেখকের মস্ত ভুল। না বোঝে বরঞ্চ সেও ভালো, কিন্তু বেশী বোঝাবার গরজ না লেখকের প্রকাশ পায়।

* * *

এই কথাটা তোমাদের অনেক বার বলেছি যে কেবল লেখাই শক্ত নয়, না-লেখার শক্তিও কম শক্ত নয়। অর্থাৎ, ভেতরের উচ্ছ্বাস ও আবেগের ঢেউ যেন নিরর্থক ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। আমি নিজেই যেন পাঠকের সবখানি আচ্ছন্ন ক'রে না রাখি। অ-লিখিত অংশটা তারাও যেন নিজেদের ভাব, রুচি এবং বুদ্ধি দিয়ে পূর্ণ ক'রে তোলবার অবকাশ পায়। তোমার লেখা তাদের ইঙ্গিত করবে, আভাস দেবে, কিন্তু তাদের তল্পি বইবে না। জলধর-দা তাঁর কি একটা বইয়ে মরা ছেলের বাপ মায়ের হয়ে পাতার পর পাতা এত কান্নাই কাঁদলেন যে পাঠকেরা শুধু চেয়েই রইলো, কাঁদবার ফুরসৎ পেলে না। বস্তুতঃ, লেখার অসংযম

সাহিত্যের মর্য্যাদা নষ্ট ক'রে দেয়। কেদার বাঁড়ুজ্যে চমৎকার লিখতেই পারেন, কিন্তু চমৎকার না-লিখতে পারেন না। আর এক ধরণের অসংযম দেখতে পাই অ—রের লেখায়। ছেলেটি লেখে ভালো, বিলেতেও গেছে,—এই যাওয়াটা ও একটা মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলতে পারে না। বিলেতের ব্যাপার নিয়ে ওর লেখায় এমনি একটা অরুচিকব ভক্তিগদ্‌গদ 'আদেক্‌লে-পনা' প্রকাশ পায় যে পাঠকের মন উৎপীড়িত বোধ করে। আমার গিরীন মামাকে মনে পড়ে। একবার বৈষ্ণব মেলা উপলক্ষে আমরা শ্রীধাম খেতুরিতে গিয়েছিলাম। মামার বিশ্বাস ছিল খেতুরির প্রসাদ খেলে অম্বল সারে। ষ্টীমার থেকে গঙ্গার তীরে নেমেই মামা অ্যাঃ—ক'রে উঠলেন। দেখি ভয়ার্ত্তমুখে এক পা উঁচু ক'রে আছেন।

কি হ'ল ?

বড্ড কাঁচা শ্রীগু মড়িয়ে ফেলেছি।

তাঁর ভয় ছিল, ভক্তিহীনতা প্রকাশ পেলে হয়ত অম্বল সারবে না।··· অ—পা দেবীর উপন্যাসে দেখতে পাবে বেদ বেদান্ত উপনিষৎ পুরাণ কালিদাস ভবভূতি সবাই ঢোকবার জন্যে যেন ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দেয়। ছত্রে ছত্রে গ্রন্থকারের এই মনোভাবটিই ধরা পড়ে,—ছাখো তোমরা আমি কি বিদুষী! কি পড়াটাই পড়েছি, কি জানাটাই জেনেছি। এই আতিশয্য যেন কোনমতেই না লেখার মধ্যে ধরা পড়ে। ওদের এম্‌নি সহজে আসা চাই যেন না এলেই নয়। এই না-এলেই-নয় জিনিসটাই লেখার বড়

কৌশল। এ শেখানো যায় না—আপনি শিখতে হয়। আর শেখা যায় শুধু সংযমের অভ্যাসে। পাঠককে তাক লাগিয়ে দেবার সদিচ্ছার বাহুল্যে তার স্বকীয় কল্পনার খোরাককে কখনো কৃপণতা করব না এই তত্ত্বটি লেখবার সময়ে একটি মিনিটের জন্যেও ভুল্‌লে চল্‌বে না। অথচ, বড় ভাব, বড় তত্ত্ব, বড় idea, বড় প্রকাশ, এই নিয়েই চলা চাই লেখা,—জল পড়ে, পাতা নড়ে, লাল ফুল, কালো জল আর জায়ে জায়ে ঝগড়া আর বৌয়ে বৌয়ে মনোমালিন্য কিম্বা প্রভাত মুখুজ্যের বর্ণনার নিপুণতা,—ঘরের মধ্যে ক'টা আলমারি ক'টা সোফা, প্রদীপে ক'টা সল্‌তে দেওয়া এবং আলনায় ক'টা এবং কি-পাড়ের কোঁচানো শাড়ী—এ সকলের দিনও গেছে, প্রয়োজনও শেষ হয়েছে। ও কেবল লেখার ছলে সাহিত্যকে ঠকানো।

তোমার লেখার মধ্যে আজকাল আমি অনেক আশা, অনেক ভরসা পাই। অথচ, মনের মধ্যে বেদনা বোধ করি যে এ তুমি ছেড়ে দিলে। আশ্রমে বাস ক'রে সে বস্তু কখনো হবে না। জীবনে যে ভালোবাসলে না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না, তার পরের-মুখে-ঝাল-খাওয়া-কল্পনা সত্যিকার সাহিত্য কত দিন জোগাবে? নাকটেপা-প্রাণায়ামের যোগবলে আর-যা-কিছুই হোক্ এ বস্তু হবে না। নিজের জীবনটাই হ'ল যার নীরস, বাঙ্গলা দেশের বালবিধবার মতো পবিত্র, সে প্রথম যৌবনের আবেগে যত কিছুই করুক, দু-দিনে সব মরুভূমির মত শুষ্ক শ্রীহীন হয়ে উঠবে। ভয় হয়, ক্রমশঃ হয়ত তোমার লেখার মধ্যেও অসঙ্গতি দেখা দেবে।

সবচেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই, যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সবকিছু ফুলের মতো বাইরে ফুটিয়ে তুলেছে। দেখো নি বাঙলা দেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই ভাবে, এই বুঝি গ্রন্থকারের নিজের জীবন, নিজের কথা। তাই সজ্জন-সমাজে আমি অপাংক্তেয়। কতই না জনশ্রুতি লোকের মুখে মুখে প্রচলিত।

* * *

ছেলে বয়সের একটা মস্ত দোষ এই যে, অনেক-বই-পড়ার অভিমানটা এদের পেয়ে বসে। তাই নিজের লেখার মধ্যে নিজের কিছুই থাকে না, থাকে শুধু মুখস্থ-করা পরের কথা। থাকে কারণে-অকারণে যেখানে-সেখানে গুঁজে দেওয়া বিদ্যের বাচালতা। মেয়েটিকে তুমি অতো দ্রুতবেগে লিখতে বারণ ক'রো। লেখার দ্রুতগতি কেরাণীর qualification—লেখকের নয়। এ কথা ভোলা উচিত নয়। অল্প বয়সে গল্প লেখা ভালো, কবিতা লেখা আরো ভালো, কিন্তু সমালোচনা লিখতে যাওয়া অন্যায়। তা উপন্যাসের ওপরেই হোক্, বা নারীর ওপরেই হোক্।... জীবনে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তু পাওয়া যায় তার নাম অভিজ্ঞতা। শুধু বই প'ড়ে একে পাওয়া যায় না, এবং না পাওয়া পর্য্যন্ত জানাও যায় না এর মূল্য কত। কিন্তু এ কথাও মনে রাখা উচিত যে অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা প্রভৃতি কেবল শক্তি দেয়ই না, শক্তি হরণও করে। তাই বয়স কম থাকৃতেই কতকগুলো কাজ সেরে নেওয়া উচিত। এই যেমন গল্প লেখা। আমি অনেক

সময়ে দেখেছি কম বয়সে যা লেখা যায় তার অনেক অংশই আবার বয়স বাড়লে লেখা যায় না। তখন বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য ও সঙ্কোচে বাধে। মানুষের মধ্যে শুধু লেখকই থাকে না ক্রিটিক্ও থাকে। বয়সের সঙ্গে এই ক্রিটিকটিই বাড়তে থাকে। তাই বেশী বয়সে লেখক যখন লিখতে চায়, ক্রিটিকটি প্রতি হাতে তার হাত চেপে ধরতে থাকে। সে লেখা জ্ঞান বিদ্যে বুদ্ধির দিক দিয়ে যত বড়ই হয়ে উঠুক, রসের দিক দিয়ে তার তেমনি ত্রুটি ঘট্তে থাকে। তাই আমার বিশ্বাস যৌবন উত্তীর্ণ ক'রে দিয়ে যে ব্যক্তি রস-সৃষ্টির আয়োজন করে সে ভুল করে। মানুষের একটা বয়স আছেই যার পরে কাব্য বলো, উপন্যাস বলো, আর লেখা উচিত নয়। রিটায়ার করাই কর্ত্তব্য। বুড়ো বয়সটা হচ্ছে মানুষকে দুঃখ দেবার বয়স, মানুষকে আনন্দ দেবার অভিনয় করা তখন বৃথা।

* * *

এই প্রসঙ্গে নিজের রচনা সম্বন্ধে শরৎ চন্দ্র বলিয়াছেন :—

"প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোন দিন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া লই, তাহাদিগকে ফুটাইবার জন্য যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে। মনের পরশ বলিয়া একটি জিনিস আছে, তাহাতে প্লট কিছু নাই। আসল জিনিস কতকগুলি চরিত্র—তাহাদিগকে ফুটাইবার জন্য প্লটের দরকার, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা আনিয়া যোগ করিতে হয়, সে সব আপনি আসিয়া পড়ে।" (৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রেসিডেন্সী কলেজ, বঙ্কিম-শরৎ সমিতিতে প্রদত্ত ভাষণ)

রাজনৈতিক মতামত

শরৎ চন্দ্র শুধু যে একজন অপরাজেয় কথা-শিল্পীই ছিলেন তাহা নহে, তিনি মনীষারও অধিকারী ছিলেন। মনীষী শরৎ চন্দ্রের মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার 'নারীর মূল্য,' 'স্বদেশ ও সাহিত্য' প্রভৃতি পুস্তকে এবং সাময়িক-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার নানা প্রবন্ধে। শুধু কথা-সাহিত্যিকরূপে নহে, প্রবন্ধকাররূপেও শরৎ চন্দ্র বাংলা-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট আসন দাবি করিতে পারেন।

সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে শরৎ চন্দ্রের প্রবন্ধসমূহ পাঠক-মহলে সুপরিচিত, কিন্তু রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধই সাময়িক-পত্রিকার পৃষ্ঠায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার রাজনৈতিক মতামতের সহিত বাংলার পাঠক-সাধারণের পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ নহে। শরৎ চন্দ্র শুধু যে বাংলা, তথা ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন তাহা নহে, সক্রিয়ভাবে বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান এবং অনেক দিন হাওড়া জিলা-কংগ্রেস-কমিটির সভাপতিরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রেই তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং সুভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তাঁহার সুগভীর স্বদেশ-প্রেম এবং জাতীয় আন্দোলনের সহিত যোগাযোগ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বলেন :—

"তিনি ছিলেন কংগ্রেসের একটি শক্তিস্তম্ভ। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম হইতেই তিনি বাঙ্গালার কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান তিনি হাওড়া জিলায় বিতরণ করিয়াছেন,...

"শরৎচন্দ্র শুধু সাহিত্যিকই ছিলেন না, রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহার দান ছিল এবং সেই সুবাদেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল।

"মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইলে শরৎচন্দ্র সেই আন্দোলনে যোগদান করেন। কলিকাতায় এই সময়ে যে জাতীয় বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, শরৎচন্দ্র তাহাব অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সময়ের এক দিনের কথা আমার মনে আছে; এক জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে বলিলেন—'কলম ছাড়িয়া রাজনীতিকের দলে ভিড়িয়া পড়া সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য নহে।' শরৎচন্দ্র তাহাতে হাসিয়া বলেন—'আমি কিন্তু কিছু দিনের জন্য কলম ছাড়িয়া চরকাই ধরিয়াছি।'

"শরৎচন্দ্রের এই উক্তির অর্থ ছিল এই যে, দেশমাতা যখন বিপন্না তখন ব্যক্তিগত সমুদয় চিন্তা ও অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার রক্ষায় অবতীর্ণ হওয়াই সন্তানের কর্ত্তব্য। দেশমাতৃকার প্রতি আন্তরিক প্রীতি তাঁহাতে আমরণ বিদ্যমান ছিল। বহু বৎসর যাবৎ।তনি নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য এবং হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির

সভাপতি ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। লাজুক ছিলেন বলিয়া তিনি সভা-সমিতিতে বড়-একটা যোগ দেন নাই বটে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট যুবকেরা তাঁহার নিকট হইতে অনেক প্রেরণা লাভ করিয়াছে। স্বদেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্রের এই দিকটার পরিচয় আজকার তরুণেরা তেমন জানে না। তাঁহার মন ছিল চির-সবুজ—তরুণ বাঙ্গলার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। ('ভারতবর্ষ,' ফাল্গুন ১৩৪৪)

বাংলার এই শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক রাজনৈতিক আন্দোলনের আবর্তে কেন ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, দেশের মুক্তি-আন্দোলন সম্বন্ধে কি আদর্শ তিনি পোষণ করিতেন এবং কেনই বা তিনি অবশেষে এ দেশের তথাকথিত রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর বিরূপ হইয়া হাওড়া কংগ্রেস-কমিটির সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এ সমস্ত কথা আলোচনা না করিলে শরৎ চন্দ্রকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যাইবে না। রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ ছিল, বহু প্রবন্ধে নিজস্ব অননুকরণীয় সরস ভাষায় তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

দুঃখের বিষয়, এ সম্বন্ধে পুস্তকাকারে প্রকাশিত তাঁহার রচনার সংখ্যা মুষ্টিমেয়। 'স্বদেশ ও সাহিত্যে'র স্বদেশ-বিভাগে তাঁহার মাত্র কয়েকটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। তাঁহার 'তরুণের বিদ্রোহ'ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সাময়িক-পত্রে বিক্ষিপ্ত তাঁহার রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলির সন্ধান আজিকার দিনে অনেকেই রাখেন না এবং ক্রমেই সেগুলি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। ইহার মধ্যে কোন

কোনটি সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবার যোগ্য, তাহাতে রাজনীতি বিষয়ে শরৎ চন্দ্রের দূরদৃষ্টির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতে হয়।

জয়মাল্য

শরৎ চন্দ্র স্বদেশবাসীর যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, অল্প সাহিত্যিকের ভাগ্যেই তাহা ঘটে। দেশের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলিও তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করে নাই। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে জগত্তারিণী সুবর্ণপদক প্রদান করেন; পূর্ব্ব-বারে (ইং ১৯২১) এই পদক রবীন্দ্রনাথকেই সর্ব্বপ্রথম দেওয়া হয়। ১৯২৫ সনে তিনি ঢাকা, মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি এবং ১৯৩৪ সনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৬ সনের জুলাই মাসে সমাবর্ত্তন-উৎসবে ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডি. লিট্' বা সাহিত্যাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতের অন্য প্রাদেশিক ভাষাগুলি অনুবাদ ও আত্মসাতের দ্বারা শরৎ চন্দ্রকে প্রভূত সম্মান দেখাইয়াছেন। সুদূর ইউরোপেও তাঁহার খ্যাতি বিস্তারলাভ করিয়াছে। তাঁহার 'শ্রীকান্তে'র ইংরেজী সংস্করণের ইতালীয় অনুবাদ পাঠে মুগ্ধ হইয়া মনস্বী রমঁ্যা রলাঁ তাঁহাকে পৃথিবীর "প্রথম শ্রেণীর" ঔপন্যাসিকের সম্মান দিয়াছিলেন।"*

---

* 'প্রবাসী,' জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ পৃ ২৫০ দ্রষ্টব্য।

সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রবীন্দ্র-রচনাকে তিনি আদর্শ করিয়াছিলেন। কবির প্রতি যে শ্রদ্ধা তিনি পোষণ করিতেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। কবিও তাঁহাকে জয়মাল্যদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৩৪৩ সালের ২৫এ আশ্বিন শরৎ চন্দ্রের ৬১তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে এই বলিয়া অভিনন্দিত করেন ঃ—

"কল্যাণীয় শরৎচন্দ্র—তুমি জীবনের নির্দ্দিষ্ট পথের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েচ। এই উপলক্ষ্যে তোমাকে অভিনন্দিত করবার জন্যে তোমার বন্ধুবর্গের এই আমন্ত্রণসভা।

"বয়স বাড়ে, আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়, তা নিয়ে আনন্দ করবার কারণ নেই। আনন্দ করি যখন দেখি জীবনের পরিণতির সঙ্গে জীবনের দানের পরিমাণ ক্ষয় হয় নি। তোমার সাহিত্যরসসত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পরিবেষণপাত্র, তাই জয়ধ্বনি করতে এসেছে তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে।······

"আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক কেবল যে তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে। ইতস্তত যদি কিছু প্রতিবাদ থাকে তো ভালোই, না থাকলেই ভাবনার কারণ, এই সহজ কথাটা লেখকেরা অনেক সময়ে মনের খেদে ভুলে যায়।···যে লেখায় প্রাণ আছে প্রতিপক্ষ তার দ্বারা তার যশের মূল্য বাড়িয়ে তোলে, তার

বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের তারা বিপরীত-পন্থার ভক্ত। রামের ভয়ঙ্কর ভক্ত যেমন রাবণ।

"জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান ক'রে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মিসমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্ত্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়-রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন ক'রে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরাণ আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশী হয়েছে এমন আর কারো লেখায় তারা হয় নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে কিন্তু সর্ব্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।

"আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করতে পারতুম যদি তাঁকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার। কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্যে অপেক্ষা করেন নি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে স্বত-উচ্ছ্বসিত। শুধু কথা-সাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংস্রবে আসবার জন্যে বাঙালীর ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।

"সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে, চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয় কল্পনাশক্তির পূর্ণ দৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্য্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বাংলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করুন,—তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য ক'রে দেখতে, স্পষ্ট ক'রে মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষে গুণে ভালোয় মন্দয়,—চমৎকারজনক শিক্ষাজনক কোনো দৃষ্টান্তকে নয়, মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়।" ('বিচিত্রা,' অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩)

মৃত্যু

নানা রোগের আক্রমণে শরৎ চন্দ্রের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। শেষে অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়াইল। তখন তাঁহাকে পার্ক নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে অস্ত্রোপচার করিয়াও কোন ফল হইল না। ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ (২ মাঘ ১৩৪৪) তারিখে, ৬২ বৎসর বয়সে, তাঁহার আত্মা বাঞ্ছিত লোকে প্রয়াণ করিল। রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষুদ্র কবিতাটিতে শোকাহত দেশবাসীর মর্ম্মবেদনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে,

দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি'
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি'।"

মনুষ্যত্ব ও চরিত্র

শরৎ চন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল অপরিসীম। তিনি গল্প-উপন্যাসে পতিতা এবং পাপীর চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়া অনেকের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল যে, তিনি নিজেও ছিলেন চরিত্রহীন, উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। তাঁহার জীবিতাবস্থায় নিন্দুকেরা তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে কত যে অপবাদ রটনা করিয়াছিল, তাহার আর অন্ত নাই। অবশ্য এ কথা সত্য যে, ছেলেবেলা হইতে নিয়মশৃঙ্খলার নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতরে সীমাবদ্ধ জীবনের উপর তাঁহার একটা গভীর বিরাগ ছিল এবং যৌবনে তিনি নানা প্রকার নেশার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে তাঁহার মনুষ্যত্ব এবং বিবেকবুদ্ধি লোপ পায় নাই, এ কথা অধিকাংশ লোকেই অবগত নহেন। অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীহরিদাস শাস্ত্রীর নিকট দীর্ঘকালের পানাভ্যাস পরিত্যাগের যে-ঘটনাটি তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা হইতে তাঁহার দরদী কোমল অন্তঃকরণ এবং চরিত্রের দৃঢ়তা উভয়েরই পরিচয় পাওয়া যাইবে :—

"একদিন অত্যন্ত দুর্য্যোগের মধ্যে সকাল বেলায় দাদার বাজে-শিবপুরের বাসাবাড়ীতে হাজির হইয়াছি।...

চা খাইতে খাইতে দাদা বলিলেন—"শ্রীরামপুর থেকে সেদিন একটি মেয়ে এসেছিল, নাম···। অদ্ভুত মেয়ে—চেন কি?

—না, কি রকম অদ্ভুত মেয়ে?

—এসেই আমায় বল্‌লে কি না, 'অনেক দিন থেকে ইচ্ছা করছি আপনার সঙ্গে দেখা করব। আত্মীয় বন্ধু যাকেই বলি, সেই বলে—তুমি ভদ্র ঘরের মেয়ে, তুমি যাবে শরৎ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে—তোমার সাহস ত কম নয়, তা আপনি কি এমনি যে কোনও যুবতী মেয়ে আপনার কাছে আসতে পারে না?'—শুনে বেশ কৌতুক বোধ হ'ল—বলিয়া দাদা হাসিতে লাগিলেন।

আমিও হাসিলাম। বলিলাম—"আপনি কি জবাব দিলেন?"

—হাঁ জবাব একটা দিলাম বই কি। বল্‌লাম—তাঁরা যদি দশ বছর আগেকার শরৎ বাবু সম্বন্ধে এ কথা ব'লে থাকেন ত আমি কিছু বল্‌তে চাই নে। কারণ তখন আমি দিন রাতের মধ্যে কখনই প্রকৃতিস্থ থাকতাম না; সর্ব্বদাই মদের নেশায় চুর। তবুও বল্‌তে পারি অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়ও কখনও কোন নারীর অমর্য্যাদা আমি করি নি—আর এখন ত আমি তোমাদের বড়দা—নির্ভয়ে আস্‌বে।

—খুব বুঝি মদ খেতেন দাদা?

—হাঁ ভাই। কিন্তু এক দিনে ছেড়ে দিলাম, অর্থাৎ মাতাল আর হই নি।

—কি ক'রে ছাড়লেন?

—আচ্ছা বল্‌ছি শোন। আর এক চাটুজ্জে ও আমি আর আমাদের একটি বর্ম্মী বন্ধু একসঙ্গে মদ খেতাম, বর্ম্মী বন্ধুটির হঠাৎ হ'ল হার্টের অসুখ, ডাক্তার একেবারে মদ খাওয়া বন্ধ ক'রে দিলেন। অফিসে ছুটি নিয়ে বাড়ী ব'সে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। একদিন—রাত্রি তখন ১১টা হবে, চাটুজ্জে এসে আমার দরজা ভাঙ্গতে লাগলো—'ও শরৎবাবু! ও শরৎবাবু!' বুঝলাম দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, পিপাসা বেড়েছে, কিছু মদ চাই। আমার ঘরে যা ছিল তাতে পিপাসার শান্তি হ'ল না। আরও চাই—চাটুজ্জে বল্‌লে, চল বর্ম্মী বন্ধুর বাড়ী। প্রথমটা আমি রাজি হই নি, শেষে যেতেই হ'ল তার সঙ্গে। রাত্রি তখন ১টা হবে। অনেক ডাকাডাকির পর বন্ধু-গৃহিণী জানালা দিয়ে জানালেন—তাঁর স্বামী অসুস্থ, আমরা যেন দয়া ক'রে চলে যাই। ডাকহাঁকে বন্ধুটিও জেগেছিল, এসে তার স্ত্রীকে অনুরোধ করতে লাগলো—'দাও না খুলে, ঘরে ত একটা বোতল রয়েছে। ওরা খাক না—আমি ত আর খাচ্ছি না।'—আমার কতকটা জ্ঞান ছিল, ফিরে আসতে চাইলাম, কিন্তু চাটুজ্জে রাজি হ'ল না। একটা ছোট বেতের টেবিলের পাশে তিন জন পাশাপাশি বেতের চেয়ারে বসেছি, সামনে মেটিঙের উপর বন্ধু-পত্নী ব'সে স্বামীকে পাহারা দিচ্ছেন, আমরা মদ খাচ্ছি। বন্ধু-পত্নীটি দিনের শ্রমে বোধ হয় ক্লান্ত ছিল, ঝিমুতে লাগলো দেখে চাটুজ্জে বর্ম্মী বন্ধুটিকে ইসারায় এক পেগ নেবার অনুরোধ জানাল। আমি মানা করলাম, বর্ম্মী বন্ধুটিও পত্নীকে দেখিয়ে অস্বীকার করলো। আরও দু-একবার

মদ খাবার পরে দেখা গেল বন্ধু-পত্নী মেটিঙের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে। চাটুজ্জে আবার অনুরোধ জানাল—এবার সে আর অস্বীকার না ক'রে টেনে নিলে। দু-বাবের পর তৃতীয় বারে নিজ হাতে পাত্র টেনে নিয়ে এক চুমুকে যখন নিঃশেষ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে আঁ—আঁ—একটা বিকট শব্দ ক'বে ঢলে পড়ল। ঐ শব্দে স্ত্রী ছেলেপিলে সকলের ঘুম ভেঙে গেছে, সকলেই তার বুকের উপর লুটোপুটি ক'বে এমনই কলবব তুল্‌লো, কোথায় গেল নেশা ছুটে। সেই বাত্রে থানা পুলিস ক'রে পবদিন তার শেষ গতি ক'রে বাড়ী এসে প্রতিজ্ঞা কবলাম আর মাতাল হব না। চাটুজ্জেও প্রতিজ্ঞা করেছিল, কিন্তু বক্ষা করতে পারে নি।—বল ত হরিদাস, একটি ভদ্রলোক—স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখে ঘুমোচ্ছিল, রাত একটায় দুটো মাতাল তাকে টেনে তুলে একেবারে মেরে এল! এর পরও যদি মাতালের বিবেক না আসে তবে আর কিসে আসবে?—বলিয়া দাদা চুপ করিলেন।" ('সাহানা,' ১৩৪৬)

শরৎ চন্দ্র ছিলেন নারীজাতির অকৃত্রিম দরদী বন্ধু। তাঁহার সাহিত্যে নারী-চরিত্রকে তিনি মহনীয় করিয়া আঁকিয়াছেন। শরৎ চন্দ্র পতিতাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি যে ইন্দ্রিয়-সম্পর্কে সংযত এবং তাহাদের দেহোপভোগের লালসা হইতে মুক্ত ছিলেন, শ্রীহরিদাস শাস্ত্রীর স্মৃতিকথা পড়িলে এ ধারণাই বদ্ধমূল হয়। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন :—

"অনেক ক্ষণ বাদে আমি বলিলাম, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো দাদা?"

—কি বলো।

—অনেক লোকে আপনার চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলে, সব দিকেই আপনি না কি উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন!

দাদা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌লেন—"তোমার কি মনে হয়?"

—আমার বিশ্বাস হয় না।

—কেন?

—কারণটা ঠিক বলতে পারবো না, মন বিশ্বাস করতে চায় না।

—আমি বলি কাবণটা আমায় ভালবাসো ব'লে তোমার মনের আদর্শ থেকে আমায় খাটো ক'রে দেখতে ইচ্ছা হয় না তোমার। কিন্তু কোন্ সাহসে তুমি আমায় এ কথা জিজ্ঞাসা করলে? এমনও ত হ'তে পারে যে, আমার সম্বন্ধে লোকের যা কিছু ধারণা, সব সত্যি। আমার মুখের স্বীকারোক্তি শুন্‌লে তোমার কিছু শান্তি হবে কি?

—না। কিন্তু আমার মন বলে সবই মিথ্যা। লোকে ঠিক কথা জানে না ব'লেই বলে।

দাদা চুপ করিয়া রহিলেন। কতক ক্ষণ বাদে বলিলেন—"দেখ হরিদাস, আমি সত্যিই তোমায় ভালবাসি—তার মধ্যে কোন ফাঁক নেই। অন্যে এ কথা জিজ্ঞাসা করলে কোন জবাবই পেত না, তার কারণ সাধারণ লোকের ধারণায় কি আসে যায়? আর সে ধারণা কত দিনের জন্যেই বা। একদিন আমি থাকবো না,

তারাও থাকবে না, লোকে হয়ত আমার ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয়ই জানতে চাইবে না। তখনও যদি আমার কোন লেখা বেঁচে থাকে, তা নিয়েই আমার বিচার করবে তারা, আমার চরিত্র নিয়ে নয়। তবুও তোমার যখন জানতে ইচ্ছা হয়েছে, জানাব। বাস্তবিকই তাদের ধারণা মিথ্যা। অর্থাৎ নারীজাতি সম্বন্ধে আমার চরিত্র কোন কালেই উচ্ছৃঙ্খল ছিল না, এখনও নয়। নেশার চূড়ান্ত করেছি, অনেক অস্থানে কুস্থানে গিয়েছি, কিন্তু তুমি সে সব জায়গায় খবর নিয়ে জান্‌তে পার তারা সকলেই আমায় শ্রদ্ধা করতো। কেউ দাদা ঠাকুর, কেউ বাবা ঠাকুর বল্‌তো। কারণ অত্যন্ত মাতাল অবস্থায়ও তাদের দেহের উপর আমার কখনও লালসা হয় নি, তার কারণ এ নয় যে আমি অত্যন্ত সংযমী, সাধু, নীতিবাগীশ,—কারণ এই যে ওটা চিরদিনই আমার রুচিতে ঠেকেছে। যাকে ভালবাসতে পারি নে, তাকে উপভোগ করবার লালসা আমার দেহে জেগে ওঠে নি কখনও। আরও কিছু— বলিয়া দাদা চুপ করিলেন।

প্রশ্ন করলাম—"আর কিছু, কি?"

—বিশ্বকবির গানটা তোমার মনে আছে কি?

কথনো কুপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ স্মরি সরমেতে হই সারা।

প্রশ্ন করিলাম—"তার মানে?"

—তার মানেও শুন্‌তে চাও? আচ্ছা শোনো। প্রথম যৌবনে আমি একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম। ভালবাসা

নিষ্ফল হ'ল, কিন্তু সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলার মধ্যে সে এসে চিরদিন দাঁড়িয়েছে আমার সামনে। সশরীরে যে নয় সে তোমায় বোঝাতে হবে না বোধ হয়।

—না। তার পর?

—তার পর—তার পরিচয় চাও ত? না, তা দেবো না। আজ শুধু আর একটি কথা তোমায় বল্‌বো—এ সব কথা নিয়ে তুমি কখনও কারও সঙ্গে তর্ক করতে যেয়ো না—এইটিই আমার আদেশ রইলো তোমার উপর।

এমন লোক থাকা অসম্ভব নয় যিনি মনে করিবেন আমি গল্প লিখিতেছি। তাঁহাদের বলিতে চাই যে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকিলে, পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি সম্বন্ধে—তা তাঁর প্রশংসারই হউক, নিন্দারই হউক—আমি কখনই ইহা প্রকাশ করিতাম না। তত্ত্বান্বেষীগণকে একটি বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন তাঁরা জানেন নারীজাতি সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল ছিল সর্ব্বদা জাগ্রত। নারীর কলঙ্ক সম্বন্ধে তিনি সাধারণতঃ বিশ্বাস করিতেন না।* এবং তাদের ভুলের জন্য সর্ব্বদাই তিনি হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিতেন।"

---

* "নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নাই।"—'শ্রীকান্ত,' ১ম পর্ব্ব।

রচনাবলী

শরৎ-সাহিত্যের পঠন-পাঠন দিন দিন বাড়িতেছে। তাঁহার গ্রন্থগুলি নানা ভাষায় অনূদিত হইতেছে। রঙ্গালয় ও সিনেমাগুলিতেও তাঁহার গল্প-উপন্যাস নাট্যাকারে রূপান্তরিত হইয়া প্রদর্শিত হইতেছে।

শরৎ চন্দ্রের কোন্ রচনা কবে কোথায় প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহার নির্দ্দেশ সহ তাঁহাব রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা সঙ্কলন করিয়া দিলাম। শরৎ চন্দ্রের অনেকগুলি পুস্তকের প্রথম সংস্করণে প্রকাশকাল আদৌ মুদ্রিত হয় নাই; অনেকগুলিতে কেবল সালের উল্লেখ আছে—মাসের উল্লেখ নাই। তালিকায় বন্ধনী-মধ্যে সন-তারিখযুক্ত যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওষা হইয়াছে তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত। একই বৎসরে প্রকাশিত একাধিক পুস্তকের ক্রম-নির্ণয়ে এই ইংরেজী তারিখগুলি অপরিহার্য্য।

১। **বড়দিদি** (উপন্যাস)। ১৩২০ সাল (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১৩)। পৃ. ৭৯।

১৩১৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত। প্রথম দুই সংখ্যায় লেখকের নাম মুদ্রিত হয় নাই।

'বড়দিদি'ই শরৎ চন্দ্রের মুদ্রিত পুস্তকগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম; ইহা প্রকাশ করেন—'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল।

২। **বিরাজ বৌ** (উপন্যাস)। ? (২ মে ১৯১৪)। পৃ. ১৭৫।

১৩২০ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

৩। **বিন্দুর ছেলে** ও অন্যান্য গল্প। [শ্রাবণ ১৩২১] (৩ জুলাই ১৯১৪)। পৃ. ২১১।

ইহাতে "বিন্দুর ছেলে," "রামের সুমতি" ও "পথ-নির্দ্দেশ"—এই তিনটি গল্প আছে। এগুলি প্রথমে 'যমুনা' পত্রিকায় যথাক্রমে শ্রাবণ ১৩২০, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯ ও বৈশাখ ১৩২০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় এই পুস্তকের প্রথম গল্পটির ইংরেজী অনুবাদ "Bindu's Son" নামে 'মডার্ন রিভিয়ু' (ফেব্রুয়ারি-জুন ১৯২৭) পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।

৪। **পরিণীতা** (গল্প)। ইং ১৯১৪ (১০ আগষ্ট)। পৃ. ১১৫।

১৩২০ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা 'যমুনা'য় প্রথম প্রকাশিত।

৫। **পণ্ডিত মশাই** (উপন্যাস)। ১৩২১ সাল (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৪)। পৃ. ১৪৮।

১৩২১ সালের বৈশাখ ও শ্রাবণ-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

৬। **মেজদিদি** ও অন্যান্য গল্প। ? [অগ্রহায়ণ ১৩২২] (১২ ডিসেম্বর ১৯১৫)। পৃ. ১৭১।

ইহাতে তিনটি গল্প আছে—"মেজদিদি," "দর্প-চূর্ণ" ও "আঁধারে আলো"। এগুলি প্রথমে ১৩২১ সালের 'ভারতবর্ষে' যথাক্রমে

কার্ত্তিক, মাঘ ও ভাদ্র-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী কালে "দেওঘরের স্মৃতি" ('ভারতবর্ষ,' আষাঢ় ১৩৪৪) গল্পটিও এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

৭। **পল্লী-সমাজ** (উপন্যাস)। মাঘ ১৩২২ (১৫ জানুয়ারি ১৯১৬)। পৃ. ২৮০।

১৩২২ সালের আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত। পুস্তকের ১৪শ সংস্করণটি সংশোধিত।

৮। **চন্দ্রনাথ** (উপন্যাস)। ? (১২ মার্চ ১৯১৬)। পৃ. ১৫৭।

১৩২০ সালের বৈশাখ-আশ্বিন সংখ্যা 'যমুনা'য় প্রথম প্রকাশিত। 'চন্দ্রনাথে'র ১৪শ সংস্করণে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

"চন্দ্রনাথ গল্পটি আমার বাল্য রচনা। তখনকার দিনে গল্পে উপন্যাসে কথোপকথনের যে-ভাষা ব্যবহার করা হইত এই বইখানিতে সেই ভাষাই ছিল। বর্ত্তমান সংস্করণে মাত্র ইহাই পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলাম। ইতি ১৮ই আশ্বিন, ১৩৪৪। গ্রন্থকার।"

৯। **বৈকুণ্ঠের উইল** (গল্প)। ১৩২৩ সাল (৫ জুন ১৯১৬)। পৃ. ১৩৮।

১৩২৩, জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

১০। **অরক্ষণীয়া** (গল্প)। কার্ত্তিক ১৩২৩ (২০ নবেম্বর ১৯১৬)। পৃ. ১৭৪।

১৩২৩ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

১১। **শ্রীকান্ত,** ১ম পর্ব্ব (উপন্যাস)। [মাঘ ১৩২৩] (১২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭)। পৃ. ২৪৩।

১৩২২ সালের মাঘ-চৈত্র ও ১৩২৩ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' "শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী" নামে প্রথমে প্রকাশিত।

ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন—K. C. Sen ও Theodosia Thompson. ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এই অনুবাদ (পৃ. ১৭৫) *Srikanta* নামে E. J. Thompsonএর ভূমিকা সহ অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে।

১২। **দেবদাস** (উপন্যাস)। আষাঢ় ১৩২৪ (৩০ জুন ১৯১৭)। পৃ. ১৫৬।

১৩২৩ সালের চৈত্র ও ১৩২৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

১৩। **নিষ্কৃতি** (গল্প)। ? (১ জুলাই ১৯১৭)। পৃ. ১২৫।

ইহার প্রথমাংশ "ঘর-ভাঙ্গা" নামে ১৩২১ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'যমুনা'য় ও সমগ্র অংশ ১৩২৩ সালের ভাদ্র, কার্ত্তিক ও পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথমে প্রকাশিত হয়।

১৯৪৪ সনের জুন মাসে শ্রীদিলীপকুমার রায় 'নিষ্কৃতি'র ইংরেজী অনুবাদ *Deliverance* নামে (পৃ. ১৬ + ১০৪) প্রকাশ করিয়াছেন। অনুবাদটি "Revised by Sri Aurobindo. With a Preface by Rabindranath Tagore."

১৪। **কাশীনাথ** (গল্প)। ভাদ্র ১৩২৪ (১ সেপ্টেম্বর ১৯১৭)। পৃ. ১৯২।

ইহাতে সাতটি গল্প আছে। এগুলির নাম ও প্রথম প্রকাশ-কালের নির্দ্দেশ—১। কাশীনাথ ('সাহিত্য,' ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯) ; ২। আলো ও ছায়া ('যমুনা,' আষাঢ়, ভাদ্র ১৩২০) ; ৩। মন্দির ('কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন') ; ৪। বোঝা ('যমুনা,' কার্ত্তিক-পৌষ ১৩১৯) ; ৫। অনুপমার প্রেম ('সাহিত্য,' চৈত্র ১৩২০) ; ৬। বাল্য-স্মৃতি ('সাহিত্য,' মাঘ ১৩১৯) ; ৭। হরিচরণ ('সাহিত্য,' আষাঢ় ১৩২১)।

১৫। **চরিত্রহীন** (উপন্যাস)। ? (১১ নবেম্বর ১৯১৭)। পৃ. ৫৬৬।

ইহা প্রথমে ১৩২০ সালের কার্ত্তিক-চৈত্র ও ১৩২১ সালের 'যমুনা'য় আংশিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ১৩৪৪ সালে মুদ্রিত ৫ম সংস্করণ 'চরিত্রহীনে'র জন্য গ্রন্থকারের এই ভূমিকাটি স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু দপ্তরীর ভুলে পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয় নাই ; ভূমিকাটি এইরূপ :—

"চরিত্রহীনের গোড়ার অর্দ্ধেকটা লিখেছিলাম অল্প বয়সে। তার পরে ওটা ছিল প'ড়ে। শেষ করার কথা মনেও ছিল না, প্রয়োজনও হয় নি। প্রয়োজন হ'ল বহুকাল পরে। শেষ করতে গিয়ে দেখতে পেলাম বাল্য রচনার আতিশয্য ঢুকেছে ওর নানা স্থানে, নানা আকারে। অথচ, সংস্কারের সময় ছিল না— ঐ ভাবেই ওটা রয়ে গেল। বর্ত্তমান সংস্করণে গল্পের পরিবর্ত্তন না ক'রে সেইগুলিই যথাসাধ্য সংশোধন ক'রে দিলাম। গ্রন্থকার। ১৪।৭।৩৭।"

১৬। **স্বামী** (গল্প)। ফাল্গুন ১৩২৪ (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮)। পৃ. ৯১।

ইহাতে "স্বামী" ও "একাদশী বৈরাগী" নামে দুইটি গল্প আছে। প্রথমটি ১৩২৪ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা 'নারায়ণে' এবং দ্বিতীয়টি ১৩২৪ সালের কার্ত্তিক-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথমে প্রকাশিত হয়।

১৭। **দত্তা** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩২৫ (২ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)। পৃ. ২৬৭।

১৩২৪ সালের পৌষ-চৈত্র ও ১৩২৫ সালের বৈশাখ-ভাদ্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

১৮। **শ্রীকান্ত**, ২য় পর্ব্ব (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩২৫ (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৮)। পৃ. ১৯২।

১৩২৪ সালের আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-চৈত্র ও ১৩২৫ সালের বৈশাখ-আষাঢ়, ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

১৯। **শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী**, ১-৭ খণ্ড। ইং ১৯১৯-৩৫। (বসুমতী)

১ম খণ্ড (২০ অক্টোবর ১৯১৯) :—দত্তা, পরিণীতা, শ্রীকান্ত ১ম পর্ব্ব, অরক্ষণীয়া, একাদশী বৈরাগী, মেজদিদি, মামলার ফল।

২য় খণ্ড (২০-১-২০) :—শ্রীকান্ত ২য় পর্ব্ব, দেবদাস, দর্প-চূর্ণ, পল্লী-সমাজ, বড়দিদি।

৩য় খণ্ড (১৮-৬-১৯২০) :—স্বামী, বৈকুণ্ঠের উইল, পণ্ডিত মশাই, আঁধারে আলো, চন্দ্রনাথ, নিষ্কৃতি।

৪র্থ খণ্ড (২৫-৯-২০) :—চরিত্রহীন, ছবি, বিলাসী।

৫ম খণ্ড (২১-২-২৩) :—গৃহদাহ, বামুনের মেয়ে, মহেশ।

৬ষ্ঠ খণ্ড (২৫-৯-৩৪) :— শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্ব্ব, নব-বিধান, ষোড়শী, হরিলক্ষ্মী, অভাগীর স্বর্গ।

৭ম খণ্ড (১৭-৯-৩৫) :— শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্ব, দেনা-পাওনা, রমা, নারীর মূল্য।

২০। **ছবি** (গল্প-সমষ্টি)। মাঘ ১৩২৬ (১৬ জানুয়ারি ১৯২০)। পৃ. ১০৪।

সূচী :—"ছবি" (সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত ১৩২৬ সালের পূজা-বার্ষিকী 'আগমনী'), "বিলাসী" ('ভারতী,' বৈশাখ ১৩২৫) ও "মামলার ফল" (১৩২৫ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত বার্ষিকী 'পার্ব্বণী')।

২১। **গৃহদাহ** (উপন্যাস)। ? (২০ মার্চ ১৯২০)। পৃ. ৫৩২।

১৩২৩ সালের মাঘ-চৈত্র ; ১৩২৪ সালের বৈশাখ-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ; ১৩২৫ সালের পৌষ-চৈত্র ; ১৩২৬ সালের আষাঢ়-অগ্রহায়ণ, পৌষ-মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

২২। **বামুনের মেয়ে** (উপন্যাস)। ? [আশ্বিন ১৩২৭]।

ইহা শিশির পাবলিশিং হাউস-প্রবর্ত্তিত "উপন্যাস সিরিজ"-এর ২য় বর্ষের প্রথম উপন্যাস (নং ১৩)—দ্র° ১৩২৭ সালের কার্ত্তিক-সংখ্যা 'প্রবাসী'র বিজ্ঞাপন।

২৩। **নারীর মূল্য** (সন্দর্ভ)। ? (১২ এপ্রিল ১৯২৩)। পৃ. ১৩৩।

ইহা শরৎ চন্দ্রের বড় দিদি "শ্রীমতী অনিলা দেবী"র ছদ্ম নামে ১৩২০ সালের বৈশাখ-আষাঢ় ও ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা 'যমুনা'য় প্রথমে প্রকাশিত হয়।

পুস্তকে "প্রকাশকের নিবেদন"টি উদ্ধৃত করিতেছি; উহা শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার-স্বাক্ষরিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রেরই রচনা:—

"১৩২০ সালের 'যমুনা' মাসিকপত্রে নারীর মূল্য প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকরূপে যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমরা এগুলি গ্রন্থাকারে ছাপিবার অনুমতি লাভ করি।

"কি মনে করিয়া যে শরৎবাবু তখন আত্মগোপন করিয়া শ্রীমতী অনিলা দেবীর ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে তিনিই জানেন, তবে, তাঁহার ইচ্ছা ছিল এম্‌নি আরও কয়েকটি 'মূল্য' লিখিয়া 'দ্বাদশ মূল্য' নাম দিয়া পরে যখন গ্রন্থ ছাপা হইবে, তখন তাহা নিজের নামেই বাহির করিবেন। তার পরে, এই দীর্ঘ দশ বৎসর কাটিয়া গেল, না লিখিলেন তিনি আর কোন মূল্য, না হইতে পাইল 'দ্বাদশ মূল্য' ছাপা। আমরা গিয়া বলি, মশায়, আপনার দ্বাদশ মূল্য আপনারই থাক্‌, পারেন ত আগামী জন্মে লিখিবেন, কিন্তু যে 'মূল্য' আপাততঃ হাতে পাইয়াছি, তাহার সদ্ব্যবহার করি,—তিনি বলেন, না হে, থাক্‌, এ আর বই করিয়া কাজ নাই। কিন্তু কারণ কিছুই বলেন না। এম্‌নি করিয়াই দিন কাটিতেছিল। অথচ, তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাও নয়,—আমাদের শুধু মনে হয়, তখনকার কালে নারীরা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে কথা কহিতে শিখে নাই বলিয়াই এ কাজ তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন কাগজে কাগজে ইহাঁদের দাবী-দাওয়ার প্রাবল্য ও পরাক্রান্ত নিবন্ধাদি দর্শন করিয়া এই বৃদ্ধ গ্রন্থকার ভয় পাইয়া গেছেন। তবে, এ কেবল

আমাদের অনুমান, সত্য নাও হইতে পারে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, এ বই ছাপাইবার তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা প্রকাশ করিয়া ভাল করিয়াছি, কি মন্দ করিয়াছি, তাহা পাঠক বলিতে পারেন, আমাদের ত মনে হয় মন্দ করি নাই। কিন্তু ইহার যত কিছু দায়িত্ব সে আমাদেরই।"

২৪। **দেনা-পাওনা** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৩০ (১৪ আগষ্ট ১৯২৩)। পৃ. ৩০৭।

ইহা ১৩২৭ সালের আষাঢ়-আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র ; ১৩২৮ সালের জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক ও চৈত্র ; ১৩২৯ সালের বৈশাখ-শ্রাবণ, আশ্বিন কার্ত্তিক ও মাঘ-চৈত্র ; ১৩৩০ সালের বৈশাখ, আষাঢ় ও শ্রাবণ-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথমে প্রকাশিত হয়।

২৫। **নব-বিধান** (উপন্যাস)। আশ্বিন ১৩৩১ (অক্টোবর ১৯২৪)। পৃ. ১৩৬।

১৩৩০ সালের মাঘ-ফাল্গুন ও ১৩৩১ সালের বৈশাখ, আষাঢ় ও আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত।

২৬। **হরিলক্ষ্মী** (গল্প-সমষ্টি)। ? (১৩ মার্চ ১৯২৬)। পৃ. ৯২।

ইহাতে তিনটি গল্প আছে,—হরিলক্ষ্মী, মহেশ ও অভাগীর স্বর্গ। প্রথম গল্পটি ১৩৩২ সালের 'শারদীয়া বসুমতী'তে, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্পটি যথাক্রমে ১৩২৯ সালের 'বঙ্গবাণী'র আশ্বিন ও মাঘ সংখ্যায় প্রথমে প্রকাশিত হয়।

২৭। **পথের দাবী** (উপন্যাস)। ভাদ্র ১৩৩৩ (৩১ আগষ্ট ১৯২৬)। পৃ. ৪২৬।

ইহা ১৩২৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র; ১৩৩০ সালের বৈশাখ, আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন; ১৩৩১ সালের জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন-কার্ত্তিক, পৌষ-মাঘ; ১৩৩২ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, কার্ত্তিক-ফাল্গুন; ও ১৩৩৩ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে সমগ্রভাবে প্রথমে প্রকাশিত হয়।

"১৩৩৩ সনে ইহার ১ম সংস্করণ বাহির হইলে গবর্ণমেণ্ট এই পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিয়া দেন।"...(২য় সংস্করণ)

২৮। **শ্রীকান্ত,** ৩য় পর্ব্ব (উপন্যাস)। [চৈত্র ১৩৩৩] (১৮ এপ্রিল ১৯২৭)। পৃ. ২১৩।

১৩২৭ সালের পৌষ-ফাল্গুন ও ১৩২৮ সালের বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র-আশ্বিন ও পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' আংশিকভাবে প্রথম প্রকাশিত।

২৯। **ষোড়শী** ('দেনা-পাওনা'র নাট্য-রূপ)। ? (১৩ আগষ্ট ১৯২৭)। পৃ. ১৫৩।

৩০। **রমা** ('পল্লী-সমাজে'র নাট্য-রূপ)। ? (৪ আগষ্ট ১৯২৮)। পৃ. ১৪৪।

৩১। **তরুণের বিদ্রোহ** (সন্দর্ভ)। ইং ১৯২৯ (১৮ এপ্রিল ১৯২৯)। পৃ. ২৩।

"১৯২৯ সালের ইষ্টারের ছুটিতে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভাপতির আসন হইতে প্রদত্ত বক্তৃতা।"

সরস্বতী লাইব্রেরি কর্তৃক এই পুস্তিকাখানি প্রচারের তিন বৎসর পরে আর্য্য পাবলিশিং কোং ইহার পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ প্রচার করেন (২৩ আগষ্ট ১৯০২)। এই সংস্করণে "তরুণের বিদ্রোহ" ছাড়া ১৩২৮ সালের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা 'নারায়ণে' প্রকাশিত "সত্য ও মিথ্যা" প্রবন্ধটিও স্থান পাইয়াছে।

৩২। **শেষ প্রশ্ন** (উপন্যাস)। বৈশাখ ১৩৩৮ (২ মে ১৯৩১)। পৃ. ৪০০।

ইহা 'ভারতবর্ষে'র ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ-কার্ত্তিক, মাঘ-চৈত্র ; ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, কার্ত্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন ; ১৩৩৬ সালের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ও চৈত্র ; ১৩৩৭ সালের চৈত্র ও ১৩৩৮ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রথমে প্রকাশিত হয়। কিন্তু "ভারতবর্ষে প্রকাশিত রচনার সহিত পুস্তকে মুদ্রিত উপন্যাসের যে সর্ব্বত্র মিল নাই, এ কথা বলা প্রয়োজন।"

৩৩। **স্বদেশ ও সাহিত্য** (সন্দর্ভ)। ভাদ্র ১৩৩৯ (ইং ১৯৩২)। পৃ. ১৫৬।

আর্য্য পাবলিশিং কোম্পানি এই পুস্তকখানি প্রকাশ করেন। ইহাতে যে কয়টি প্রবন্ধ আছে, সেগুলির নাম ও সাময়িক-পত্রে প্রথম প্রকাশের নির্দ্দেশ দিতেছি :—

স্বদেশ :—আমার কথা (১৯২২ সালের ১৪ জুলাই হাওড়া জিলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব পরিত্যাগকালে পঠিত অভিভাষণ) —'প্রবর্ত্তক,' শ্রাবণ ১৩২৯। স্বরাজ সাধনায় নারী (১৩২৮ সালের পৌষ মাসে শিবপুর ইনষ্টিটিউটে পঠিত অভিভাষণ)—'নব্যভারত,' পৌষ ১৩২৮। শিক্ষার বিরোধ (১৩২৮ সালে "গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যা আয়তনে" পঠিত)—'নারায়ণ,' অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩২৮। স্মৃতিকথা (১৩৩২ আষাঢ় "দেশবন্ধু স্মৃতিসংখ্যা," 'মাসিক বসুমতী' হইতে গৃহীত)। অভিনন্দন (১৩২৮ সালের জুন মাসে, স্বর্গীয় দেশবন্ধুর কারামুক্তির পর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে দেশবাসীর পক্ষ হইতে পঠিত অভিনন্দন)।

সাহিত্য :—ভবিষ্যৎ বঙ্গ-সাহিত্য (১৩৩০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বরিশাল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌শাখার অভিনন্দনের উত্তরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)। গুরু-শিষ্য সম্বাদ ('যমুনা,' ১৩২০ ফাল্গুন ৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা হইতে গৃহীত)। সাহিত্য ও নীতি (১৩৩১ সালের ১০ই আশ্বিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ)—'বঙ্গবাণী,' পৌষ ১৩৩১। সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি (১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখায় সভাপতির অভিভাষণ) —'মাসিক বসুমতী,' চৈত্র ১৩৩১। ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীত ('ভারতবর্ষ,' ১৩৩১ ফাল্গুন সংখ্যা হইতে গৃহীত)। আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ (১৩৩০ সালের ১৬ই আষাঢ় শিবপুর ইনষ্টিটিউটে, সাহিত্য-সভায় পঠিত সভাপতির অভিভাষণ)—'বঙ্গবাণী,' শ্রাবণ ১৩৩০। সাহিত্যের

রীতি ও নীতি ('বঙ্গবাণী,' ১৩৩৪ আশ্বিন সংখ্যা হইতে গৃহীত)। অভিভাষণ (১৩৩৫ সালের ভাদ্র মাসে ৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে দেশবাসীর প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর)—'কালি-কলম,' আশ্বিন ১৩৩৫। অভিভাষণ (৫৫তম বাৎসরিক জন্মতিথিতে প্রেসিডেন্সী কলেজে বঙ্কিম-শরৎ সমিতি-প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে পঠিত)—'বাতায়ন,' ২৯ আশ্বিন ১৩৩৮। যতীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা। শেষ প্রশ্ন (সুমন্দ ভবনের শ্রীমতী···সেনকে লিখিত পত্র. 'বিজলী,' ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা হইতে গৃহীত)। রবীন্দ্রনাথ (১৩৩৮ সালে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উপলক্ষে পঠিত)—'জয়ন্তী-উৎসর্গ,' পৌষ ১৩৩৮।

৩৪। **শ্রীকান্ত,** ৪র্থ পর্ব্ব (উপন্যাস)। ? (১৩ মার্চ ১৯৩৩)। পৃ. ২৪৬।

১৩৩৮ সালের ফাল্গুন-চৈত্র ও ১৩৩৯ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় প্রথম প্রকাশিত।

৩৫। **অনুরাধা-সতী ও পরেশ** (গল্প-সমষ্টি)। ? [ফাল্গুন ১৩৪০] (১৮ মার্চ ১৯৩৪)। পৃ. ১২৩।

"অনুরাধা" ১৩৪০ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে,' "সতী" ১৩৩৪ সালের আষাঢ়-সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে এবং "পরেশ" ১৩৩২ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত-সম্পাদিত পূজা-বার্ষিকী 'শরতের ফুলে' প্রথমে প্রকাশিত হয়।

৩৬। **বিরাজ বৌ** (নাট্য-রূপ)। ? (১৮ আগষ্ট ১৯৩৪)। পৃ. ১১৪।

৩৭। **বিজয়া** ('দত্তা'র নাট্য-রূপ)। ? (২৪ ডিসেম্বর ১৯৩৪)। পৃ. ১৭২।

৩৮। **বিপ্রদাস** (উপন্যাস)। মাঘ ১৩৪১ (১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫)। পৃ. ৩২৩।

ইহা ১৩৩৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র ; ১৩৪০ সালের বৈশাখ-আষাঢ়, আশ্বিন-ফাল্গুন ; ১৩৪১ সালের বৈশাখ, শ্রাবণ-ভাদ্র, কার্ত্তিক-মাঘ সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয়। 'বিচিত্রা'য় প্রকাশের পূর্ব্বে "বিপ্রদাস" ১০ম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত ৩য়-৫ম বর্ষের (১৩৩৬-৩৮) 'বেণু'তে মুদ্রিত হইয়াছিল।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

৩৯। **শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ**। চৈত্র ১৩৪৪। পৃ. ৩০।

শ্রীহর্ষ-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমুরারি দে-সম্পাদিত। "বিভিন্ন সময়ে শরৎচন্দ্র ছাত্রগণের অনুরোধে বিভিন্ন কলেজে যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেগুলি একত্রিত ক'রে এই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হ'ল।"

সূচী :—(১) পৌষ ১৩২৮ সাল শিবপুর ইন্‌ষ্টিটিউটে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের নিকট পঠিত। (২) ৫৩তম জন্মদিনে ভাদ্র ১৩৩৫ প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতির প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতা। (৩) ৫৪তম জন্মদিনে ভাদ্র ১৩৩৬ প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতির প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতা। (৪) ৫৫তম [বার্ষিক] জন্মদিবসে বঙ্কিম-শরৎ

সমিতির অভিনন্দনের উত্তরে পঠিত। (৫) আশুতোষ কলেজ বাংলা সাহিত্য-সম্মেলন দ্বিতীয় বার্ষিক (২১ ফাল্গুন ১৩৪২) উৎসবে প্রদত্ত মৌখিক বক্তৃতা। (৬) স্কটিশ চার্চ কলেজে অনুষ্ঠিত ৬২তম জন্মদিনে ৩১ ভাদ্র ১৩৪৪ "বাঙ্গালা সাহিত্য সমিতি"-প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে মৌখিক বক্তৃতা। (৭) ৬২তম জন্মদিবসে (৩১ ভাদ্র ১৩৪৪) বিদ্যাসাগর কলেজে অনুষ্ঠিত অভিনন্দন-সভায় প্রদত্ত মৌখিক বক্তৃতা।

৪০। **ছেলেবেলার গল্প** (সচিত্র)। ? [বৈশাখ ১৩৪৫; ইং এপ্রিল ১৯৩৮]। পৃ. ১২১।

সাতটি গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলির নাম:—১। লালু ('মৌচাক,' চৈত্র ১৩৪৪); ২। ছেলেধরা (ব্রজমোহন দাশ-সম্পাদিত পূজা-বার্ষিকী 'ছোটদের আহরিকা,' ১৩৪২); ৩। কোলকাতার নতুন-দা (শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র-সম্পাদিত বার্ষিকী 'গল্পের মণিমালা,' ১৩৪৪); ৪। লালু (শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীরাধারাণী দেবী-সম্পাদিত পূজা-বার্ষিকী 'সোনার কাঠি,' ১৩৪৪); ৫। বছর পঞ্চাশ পূর্ব্বের একটা দিনের কাহিনী ('পাঠশালা,' আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩৪৪); ৬। লালু; ৭। দেওঘরের স্মৃতি ('ভারতবর্ষ,' আষাঢ় ১৩৪৪)।

৪১। **শুভদা** (উপন্যাস)। ? (৫ জুন ১৯৩৮)। পৃ. ২৫৪।

৪২। **শেষের পরিচয়** (উপন্যাস)। ? (৭ জুন ১৯৩৯)। পৃ. ৪১৪।

ইহার ১৫ পরিচ্ছেদ ("রাখাল এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, নীরবে বাহির হইয়া গেল।" পর্য্যন্ত) প্রথমে 'ভারতবর্ষে' (১৩৩৯,

আষাঢ়-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন-চৈত্র ; ১৩৪০, বৈশাখ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ; ১৩৪১, আষাঢ়-শ্রাবণ, কার্ত্তিক, ফাল্গুন ; ১৩৪২, বৈশাখ) প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের বাকী অংশ শ্রীরাধারাণী দেবীর রচিত।

৪৩। **শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী**। ফাল্গুন ১৩৫৪ (ইং ১৯৪৮)। পৃ. ১৯০।

বারোয়ারি উপন্যাস : শরৎ চন্দ্র তিনখানি বারোয়ারি উপন্যাসেরও অন্যতম লেখক ছিলেন ; এগুলি—

(১) 'বারোয়ারি উপন্যাস' : ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত, প্রকাশকাল মে ১৯২১। ইহার ২১শ-২২শ অধ্যায় শরৎ চন্দ্রের লিখিত।

(২) 'রসচক্র' : প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৪৩ (ইং ১৯৩৬)। ইহার ৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৩ পৃষ্ঠার ১৪ পংক্তি পর্য্যন্ত শরৎ চন্দ্রের রচনা। এই সূচনা-ভাগ 'রসচক্র' নামে ১৩৩৭ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'উত্তরা'য় প্রকাশিত হয় ; প্রকৃতপক্ষে এই অংশ প্রথমে কাশী হইতে প্রকাশিত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'প্রবাস-জ্যোতিঃ' পত্রের প্রথম সংখ্যায় (আশ্বিন ১৩২৭) "বাড়ীর কর্ত্তা" নামে মুদ্রিত হইয়াছিল।

(৩) 'ভালোমন্দ' : ১৩৪৪ সালের ১৫ই আশ্বিন তারিখের 'বাতায়নে' শরৎ চন্দ্র ইহার সূচনা করেন। ইহা এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা : শরৎ চন্দ্রের লিখিত গল্প প্রবন্ধাদি বহু রচনা পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত অবস্থায় বিভিন্ন সাময়িক-

পত্রের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়া আছে। এগুলির একটি সংগ্রহ-গ্রন্থ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। সুখের বিষয়, সম্প্রতি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এই অভাব পূরণে অগ্রসর হইয়াছেন।

পত্রাবলী

আমরা শরৎ চন্দ্রের লিখিত বহু মূল্যবান্ পত্র সংগ্রহ করিয়া 'শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী'* নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছি। ইহা প্রকাশিত হইবার পর আরও যে-সকল পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে, কেবল মাত্র সেইগুলিই বর্ত্তমান পুস্তকে মুদ্রিত হইল।

[ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখিত]

[১৯১৩ সনের শেষ ভাগে লিখিত]

পরম কল্যাণীয়,...... মাঝে মাঝে মনে করিতেছি কিছু ছুটি লইয়া বর্ম্মাতেই কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া থাকি, আর কলিকাতায় ফিরিব

---

* এই পুস্তকের কয়েকটি ত্রুটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি; তাঁহারা এগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন:—

পৃ. ৫৪ : 'প্রবাহ' হইতে উদ্ধৃত পত্রখানি শ্রীসুবোধ রায়কে লিখিত।

পৃ. ১৮১ : কেদারনাথকে লিখিত পত্রখানির খামের উপর এই অংশটুকু ছিল:—
"অন্নপূর্ণা ও ধম্মা পড়লাম। বেশ লাগ্‌লো। মন খুশী হ'ল। কিন্তু ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাসটা একটু যেন বেশী দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। শেষে রবীন্দ্রনাথের দশায় না দাঁড়ায়। শুনেছি homeopathyতে এর না কি ভালো ওষুধ আছে। ওখানে ভালো হোমিওপাথ যদি থাকে একবার consult করলে মন্দ হ'ত না। শঃ"

না। যা হয় পরে লিখিব। আপাততঃ ভাল আছি, কিন্তু লেখাপড়া সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। তোমরা আমাকে কলিকাতায় গিয়া থাকিতে বলিতেছ সত্য, কিন্তু আমার ওটা পছন্দ হয় না। চাকরি বাকরি ছাড়িয়া দিয়া ভবঘুরে হইয়া বেড়াইতে এই অসুস্থ শরীরে মোটেই পছন্দ করি না। আর, কাহারো কাছে গিয়া থাকা—সে ত একেবারেই অসম্ভব। আমি বরং হাসপাতালে মরিব, কিন্তু কিছুতেই কাহারো ঘরে এই পীড়িত দেহ লইয়া গিয়া শেষ রাখা রাখিব না। ওটা আমি ঘৃণা করি। আমার অনেক আত্মীয় বন্ধু আছে তাহা জানি, গেলে কিছু দিন যত্ন যে না হয় তা মনে করি না, কিন্তু আমি আর কাহাকেও অনর্থক ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করি না। যদি যাই, আমার বড় ভগিনীর ওখানে গিয়াই থাকিব, কেন না সেইটাই এক রকম আমার বাড়ীঘর দোর। তাঁর অবস্থাও খুব ভালো—ক্রমাগত যাইবার জন্যও পীড়াপীড়ি করিতেছেন, কিন্তু অসুস্থ শরীরে আমি কোথাও যাইতে চাহি না। আমার কেবলি ভয় পাছে হঠাৎ মরিয়া গিয়া তাঁদের বিব্রত করি। তবে আর বোধ হয় কোন আশঙ্কার হেতু নাই। বর্ষাকালটাই আমার বড় শক্ত কাল, বর্ষা ত শেষ হইল, এইবার ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিব বলিয়া ভরসা করিতেছি। আমার অসময়ে এই 'চরিত্রহীন' যদি শেষ না করিতেই পারি আর কে করিতে পারিবে তাহা গত বারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহার একটা জবাব দিয়া নিশ্চিন্ত করিবে।

আর একটা কথা জানিতে ইচ্ছা করি। "নারীর মূল্য" শেষ হইয়া গেল, ইহার যে এত বড় সুখ্যাতি হইবে তাহা মনেও করি নাই, কিন্তু এখন পরিচিত অপরিচিত লোকের নিকট হইতে ইহার বহু আলোচনা

ও চিঠিপত্র পাইয়া মনে হইতেছে, লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিলে যেমন প্রথমে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম বোধ করি ঠিক তাহাই হইতে পারিত।......

তবে, এও একটা কথা, যাঁহারাই কেন প্রতিবাদ করুন না, নিতান্ত স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া অবহেলা না করেন যেন। ভাল কথা, এটা যে আমার লেখা তাহা মণিলাল জানিল কিরূপে? মানসী, প্রবাসী, সাহিত্য, এঁরাই বা জানিলেন কেমন করিয়া? তুমি ত প্রচার করিয়া দাও নাই? অবশ্য, যাহারা আমার লেখার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাহারা বুঝিতে পারিবে, কিন্তু সাধারণের ত বুঝিবার কথা নয়।......
('যুগান্তর,' ৩ মাঘ ১৩৪৪)

* * *

। ? ।

54, 36th Street, Rangoon,
1-2-16

সবিনয় নিবেদন,

পরিচয়ের সৌভাগ্য না থাকা সত্ত্বেও মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা লাভ করিয়া আমি নিজেকে বারম্বার ধন্য জ্ঞান করিতেছি। আপনি নিজেকে বৃদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমিও ত প্রায় তাহাই। আমারও বয়স (৩৯) উনচল্লিশ হইয়াছে। তথাপি যদি বয়সে কিছু ছোট হই ত আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

পত্রে আপনি নিজের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যতার কেন্দ্রগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই আপনার জন্মভূমির প্রতি মমতা ত যায়ই নাই বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিম্বা এ কথাও হয়ত ঠিক নয় কারণ, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপরেই যে জন্মভূমি পল্লী-জননীর প্রতি স্নেহ জন্মে তাহাও নয়। আমি কলিকাতা-প্রবাসী অনেক বড় লোকের জন্মস্থানগুলি চোখে দেখিয়া আসিয়াছি—কিন্তু তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা নাই। তাঁহাদের যাহা সাধ্য তাহার শতাংশের একাংশও যদি সেদিকে দান করেন, বোধ করি দুঃখী গ্রামগুলির সৌভাগ্যের আর অন্ত থাকে না।

আমার নিজের ত সময় এবং সাধ্য দুইই এত সামান্য যে তাহা সম্পূর্ণরূপে গণনার বাহিরে ফেলিয়া দিলেও কাহাকেও দোষ দেওয়া চলে না তথাপি আমি শুধু এই চেষ্টাই করি যদি একটা লোকেরও তাহার পল্লীর উপর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সেই জন্যই অত্যন্ত অপ্রিয় এবং ক্লেশকর হইলেও পল্লী সম্বন্ধে সত্য কথাগুলিই বলিবার চেষ্টা করি। সহরের লোকেরা কল্পনা করিয়া পল্লীগ্রামের যে সকল সুখ্যাতি প্রচার করেন অনেক সময়েই যে তাহা যথার্থ নয়, বরঞ্চ পল্লীগ্রাম ক্রমশঃ অধঃপথেই যাইতেছে এই সত্য কথাটা এই পল্লী-সমাজ বইটাতে বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু চেষ্টা করায় এবং সফলতায় যাহা প্রভেদ আমার লেখাতেও বোধ করি ততটুকু মাত্রই হইয়াছে।

আপনি এটাকে নাটক আকারে প্রকাশ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। হয়ত, করিলে ভালই হয় কিন্তু আমার নিজের ত সে

ক্ষমতা নাই। অন্ততঃ আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া ত কখনো দেখি নাই। যদি আর কেহ কষ্ট করিযা করেন (যাঁহার ক্ষমতা আছে) বোধ করি ভাল হইলেও হইতে পারে। কিন্তু আমার দ্বারা হয়ত শুধু পণ্ডশ্রম মাত্র হইবে। এবং কোন থিয়েটারই তাহাদের সময় এবং সামর্থ্যের অপব্যয় করিয়া তাহাকে stage করিতে চাহিবে না। তবে, আপনার উপদেশটিও মনে রাখিয়া ভবিষ্যতে যদি কিছু করিতে পারি চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে, গ্রাম সম্পর্কীয় আমার 'পণ্ডিত মশাই' বইটাকেও কেহ কেহ 'নাটক' করিবার কথা তুলিয়াছিলেন কিন্তু হয় নাই। সেটা বোধ করি আরও ভাল হইলেও হইতে পারিত।

যাই হোক আপনার এই উপদেশটিকে আমি বিস্মৃত হইব না এবং সেজন্য আপনাকে প্রণাম করিতেছি।

নিঃ শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* * *

[শ্রীমুরলীধর বসুকে লিখিত]

54, 86th Street, Rangoon
7. 4. 16

পরম কল্যাণবরেষু—

বহু দিন পরে আপনার পত্রের জবাব দিতে বসিয়াছি। বিলম্ব এত বেশি হইয়াছে যে আপনি নিশ্চয়ই এ আশা অনেক দিন পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

আমি অত্যন্ত কুড়ে মানুষ। আমার পক্ষে এ রকম অপরাধ প্রায় স্বাভাবিক। তবে, এ ক্ষেত্রে একটা কৈফিয়ৎ এই আছে যে বড় পীড়িত

হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহা এতই বেশী যে এখানে থাকা আর চলিল না—বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অন্যত্র যাইতে হইতেছে। এ পত্র যখন আপনার হাতে পড়িবে তখন আমি আর এ ঠিকানায় থাকিব না। যদি দয়া করিয়া কখনো এ পত্রের জবাব দেন, তবে, যেমন করিয়া আমার বর্ত্তমান ঠিকানা অবগত হইয়াছিলেন তেম্‌নি করিয়াই জানিতে পারিবেন। যদিচ, বুঝিতেছি সে আবশ্যক আর হয়ত আপনার হইবে না।

কিন্তু সে কথা থাক্‌। আমার লেখা পড়িয়া আপনার ভাল লাগিয়াছে। এই আমার পরিশ্রমের পুরস্কার। আপনি যে এই কথা জানাইয়া আমাকে সুখী করিয়াছেন সেজন্য আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি—আশীর্ব্বাদ করিতেছি আপনিও এম্‌নি সুখী হোন।

ভগবানের কাছে আপনার কুশল প্রার্থনা করিতেছি।

আশীর্ব্বাদক শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* * *

[শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

শিবপুর, ২৯-৬-১৬

ভায়া,—আমাকে ব্যথাটা কুঁজো ক'রে ফেলেছে। কাল খুবই ভিজে বাড়ল বোধ করি। আসলে ব্যামোই আমার এই বুকটা।...

জানেন বোধ হয় আমার ভাগ্নীর বিয়ে এই শুক্রবারের পরের শুক্রবারে। তাতে আমারই মস্ত দায়। আবার আমি আপনার

দায়। এত দিন কথাটা আপনাকে বলি নি যে দেশে আমি 'একঘরে'—আমার কাজকর্ম্মের বাড়ীতে যাওয়া ঠিক নয়। যাক্ সে জন্যেও ভাবি নে কিন্তু টাকা দেওয়া চাই, অথচ, আমি না যাই এই তাঁদের গোপন ইচ্ছা। আমার চার-শ টাকার অকুলান। এটা আমার চাই।···আপনার শরৎ

১লা নভেম্বর। '১৮।
বাজেশিবপুর।

পরম কল্যাণবরেষু,—আজকাল ভাল আছি বটে, কিন্তু, কলকাতায় যেতে ডাক্তার বারণ করেন। অনেক দিন থেকেই দেহটা বোধ করি নিস্তেজ হয়ে আস্‌ছিল, তাই ডেঙু, war-fever, ইনফ্লুয়েঞ্জা কোনটাকেই এ বছর বাদ দিতে পারলাম না।

মনে করচি, কিছু দিন ভাগলপুর থেকে ঘুরে আসি। বাড়ীর ডাক্তার আছে, বিশেষ ভয় নেই।

আসল কথা কিন্তু 'ভারতবর্ষ' নিয়ে। 'দাদা'র সঙ্গে কতকটা কথাবার্ত্তা হয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন মীমাংসা হ'ল না। একে ত এবার দারজিলিঙ্ থেকে আসার পরে তাঁর কাণের এতটা উন্নতি হয়েছে যে, বলশালী লোকেও দু'চারটে কথার পরে হাঁপিয়ে ওঠে। আমি ত আজকাল জোরে কথা কইতেও পারি নে, পারাও বারণ।

আপনার সঙ্গে একবার দেখা হ'তে পারলে ভালই হ'ত, কিন্তু, আমার ত নড়বার চড়বার জো নেই। আপনিও যে কাজকর্ম্ম ছেড়ে

আস্‌তে পারেন সেও সম্ভব মনে করি নে। তবে রবিবার দিন দুপুর বেলা গাড়ী ক'রে যদি এদিকে একটু বেড়াতে বার হন ত হ'তেও পারে।

ভাব্‌ছিলাম, কিছু কাল যদি লেখা-পড়া বন্ধ করি ত সত্যিকারের কোনপ্রকার অপযশ আমাদের কাগজে পৌঁছয় কি না।

আবার এমনও হ'তে পারে হয়ত দু-পাঁচ দিন ভাগলপুরে বাস করার পরেই লেখার energyটা ফিরে পেতে পারি। সে হ'লে ত খুবই ভাল হয়।

আমার নাটকের কত দূর হ'ল ? বোধ করি শেষ হয়ে গেছে, না ? একটা উত্তর দেবেন।—আপনাদের শরৎ দা'।

২৪, অশ্বিনী দত্ত রোড, কলিকাতা
৫ই আষাঢ়, ১৩৪৪।

ভায়া,—জ্যাঠামশায়ের শ্রীচরণে অর্পণ করার জন্যে কন্যা এনেছেন দণ্ড বহু দূর মুসোরি থেকে। শ্রীচরণে অর্পণ করার ইঙ্গিত বোধ করি এই যে ভবিষ্যতে না লিখলে কাজকর্ম্ম না করলে ঠ্যাং ভেঙে দেওয়া হবে।

যাই হোক লাঠিটি চমৎকার। আমার কাজে লাগবে। ঠ্যাং দুটোকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিতে।—শরৎদা

* * *

[মহেন্দ্রনাথ করণকে লিখিত]

বাজে শিবপুর।

শিবপুর, ১০-১-১৮

সবিনয় নিবেদন,—আপনার পত্র পড়িয়া সুখ-দুঃখ দুইই পাইয়াছি। আমার লেখায় আপনারা যে ব্যথা পাইয়া তাহা নীরবে সহ্য করেন নাই, ইহা আমাকে কম আনন্দ দেয় নাই। এ সম্বন্ধে আমি আজ পর্য্যন্ত ১২।১৪ খানি পত্র পাইয়াছি। প্রত্যেককে আলাদা করিয়া জবাব দেওয়া সম্ভবপর নয় মনে করিয়া ছাপার লেখার ভিতর দিয়াই উত্তর দিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে বসিলাম। কারণ, সকলের বেদনাই এক ওজনের নয়, এবং, সকলেই দীর্ঘ দিন ধরিয়া তাহার অবসানের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

আমি "দেশে" পোদ জাতির অস্পৃশ্যতার কথা যখন লিখি, তখন "দেশ" বলিতে আমার নিজের গ্রামটাই মনে ছিল। আমার বেশ মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ীতে একটি পোদ বালক পানের ব্যবসা করিতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ছেলেটি আমার দিদিকে মা বলিত। তাহার এক সময়ে হঠাৎ একটা সাংঘাতিক পীড়া হয়। দিদি তাহার বমি প্রভৃতি পরিষ্কার করায়, তাহাকে ছোঁয়াছুঁয়ি করায় পাড়ার লোকে অনেক কথা বলে। দিদি তাহাতে এই জবাব দেন যে, আমাদের গৃহদেবতা 'দামোদর' যদি তাঁহার হাতে 'ভোগ' না খান ত তিনি স্বপ্ন দিবেন। কারণ এই বিশ্বাস বাড়ীতে সকলের ছিল যে কিছু একটা অনাচার হইলেই 'দামোদর' স্বপ্ন দেন। অবশ্য

এবার তিনি কোন প্রকার আপত্তি করিয়া স্বপ্ন দেন নাই। সেই পীড়ার সময় আমার স্পষ্ট স্মরণ হয় দিদিকে দিনে ৫।৬ বার করিয়া স্নান করিতে হইত।

তবে, এখন সম্বাদ লইয়া জানিতেছি যে সকল জেলায় এক প্রকার প্রথা প্রচলিত নাই। যেমন আজও কোন কোন জায়গায় ··· ছুঁইলে কাপড় ছাড়িতে হয়, কিন্তু কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলে হয় না।

এইবার আমার নিজের কথা বলিব। আমার লেখার যথার্থ তাৎপর্য্য আপনারা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কোন জাতিকে আমি অস্পৃশ্য মনে করি না এবং কাহারও হাতে জল খাইতে আমার বাধে না। বরঞ্চ, লোকের যখন বাধে তখন সেইটাই আমাকে সব-চেয়ে বাধে।

বই ছাপাইবার সময় এই ছত্রটা* ত আমি তুলিয়া দিব বটেই, আর ইহা জাতি-বিশেষের একটা মনঃপীড়ার কারণ হইবে বুঝিলে আমি লিখিতাম না। কিন্তু, আমার সকল লেখার সহিত আপনার পরিচয় থাকিলে এ সন্দেহ আপনার হইত না যে, উঁচু জাত্‌কে সত্য সত্যই 'উঁচু' জাত মনে করিয়া তাহাদিগকে 'বড' করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে বা 'নীচু' জাতিকে মনোবেদনা দিয়া humour সৃষ্টি করিবার জন্য এ কথা লিখি নাই। বরঞ্চ উল্‌টা।···

---

* ১৩২৪ সালের পৌষ-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' মুদ্রিত "শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী"র পৃ. ১৩৯ দ্রষ্টব্য।

বাজে শিবপুর,
৪ঠা আশ্বিন '২৬

সবিনয় নিবেদন,—আপনার পত্রখানি আমি দুইবার করিয়া পড়িয়াছি। আমার সেই পত্রখানির অংশবিশেষ যদি আপনার কোন কাজে আসে ত আমি খুশীই হইব। যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন আমার লেশমাত্র আপত্তি নাই। তবে আমার চিঠি লেখার প্রণালী এত কাঁচা, এত এলোমেলো যে ভাষার দিক দিয়া একটু লজ্জা করে।(!) মহেন্দ্র বাবু, আমি কেবল দুইটি জাতি মানি। আমার আন্তরিক বিশ্বাস কোন মানুষেরই কোন একটা সুনির্দ্দিষ্ট জাতি নাই, জাতি আছে কেবল মানুষের হৃদয়ের,—মস্তিষ্কের। সে কেমন জানেন? এই ধরুন আপনি নিজে। আপনার শিক্ষা, আপনার হৃদয়ের প্রশস্ততা, ইহার স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতির দুঃখে বেদনা বোধ, ইহার উদ্যম, ইহার আন্তরিকতা,—এইগুলিই বড় জাতীয়। যে আধারে ইহারা বাস করে সেই আধারটাই উঁচু জাতের। নইলে ব্রাহ্মণই কি আর দুলে-বাগ্দীই বা কি—ওইগুলা না থাকিলে কেবলমাত্র জন্মপত্রিকার লেখাগুলাই কোন মানুষকে কোনদিন উচ্চ পদ দিতে পারিবে না। সে লেখা সোনার জল দিয়া মহামহোপাধ্যায়ের কলম হইতে বাহির হইলেও না।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বেশ নাম। ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে ও কথাটাও ব্যবহার করিতে করিতে ক্রমশঃ একটা বাদ দিলেই চলিয়া যাইবে।

আপনি ঘৃণা দিয়া ঘৃণার প্রতিশোধ দিবার কথা লিখিয়াছেন। বোধ হয় আপনার কথাই সত্য। এ বিষয়ে আমার বিশেষ কোন

অভিজ্ঞতা নাই, সেই জন্য মতামত দিতে পারিলাম না। তবে, এটুকু বুঝিতে পারি কেবলমাত্র ভাল মানুষের দ্বারাই সংসারের সকল কাজ চলে না। ('পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার,' আশ্বিন ১৩৩১)

* * *

[শ্রীঅমল হোমকে লিখিত]

বাজে শিবপুর—হাওড়া

১৬-৮-১৯

পরম কল্যাণীয়েষু,

অমল, 'ভারতী'র আড্ডায় সেদিন শুনলাম তোমারও না কি খুব ফাঁড়া গিয়েছে।[১] ইংরেজের মারমূর্ত্তি খুব কাছে থেকেই দেখে নিলে ভাল ক'রে। এ একটা কম লাভ নয়। আমাদের মোহ কাটাবার কাজে এরও প্রয়োজন ছিল। দরকার মনে করলেই ওরা যে কত নিষ্ঠুর কতটা পশু হ'তে পারে, তা ইতিহাসের পাতাতেই জানা ছিল এত দিন—এবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হ'ল।

আর এক লাভ—দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন ক'রে পেলাম রবিবাবুকে। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন।

'নারায়ণে'র সময় সি আর দাশ একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, রবিবাবু যখন নাইটহুড নেন, তখন না কি দাশ-সাহেব কেঁদেছিলেন।

---

১ চিঠিখানি ১৯১৯ সনের পঞ্জাব-হাঙ্গামা ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সময় লিখিত ; শ্রীযুত হোম তখন লাহোরের দৈনিক 'ট্রিবিউন' পত্রের সহিত যুক্ত।

এখন একবার তাঁর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, আজ আমাদের বুক দশ হাত কি না বলুন।[২]

তোমার কাগজের নামই শুনেছি—কখনো চোখে দেখি নি। পাঠিও না দু-একখানা। তোমার এডিটর[৩] ত এখন জেলে। চালাও জোরসে! তোমার নাম-ডাক এখান থেকে শুনেই আমরা খুশী হই। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাজে শিবপুর—হাবড়

১২ই ভাদ্র, ১৩৩০ [আগষ্ট ১৯২৩]

অমল,

আমাকে বিসর্জ্জনটা[৪] দেখাও। শুনলাম আবার না কি হবে। সেদিন সুধীরের দোকানে[৫] গিয়ে ওকে নিয়ে যাওয়া আর হয়ে

২ ১৯১৫ সনের জুন মাসে তৎকালীন ভারত-সম্রাটের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধি লাভ করেন। ১৯১৯-এর ৩০শে মে তিনি পঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিবাদে সেই উপাধি বর্জ্জন করেন।

৩ সুপ্রসিদ্ধ কালীনাথ রায় (মৃত্যু ১৯৪৫)।

৪ ১৯২৩-এর আগষ্ট মাসের শেষে কলিকাতায় এম্পায়ার থিয়েটারের (এখন রক্সী সিনেমা) রঙ্গমঞ্চে বিশ্বভারতীর সাহায্যকল্পে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জ্জন' নাটক পর পর তিন দিন অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গ্রহণ করেন জয়সিংহের ভূমিকা।

৫ এম্. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্সের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, 'মৌচাক'-সম্পাদক।

উঠল না। তোমাদের কাগজে ভুনি বোসের প্রশংসাটা[৬] পড়ে যেতে না পারার দুঃখটা আরও যেন বেড়ে গেল। আচ্ছা, ও লেখাটা সত্যিকার বল তো কার? অমন ইংরেজী কি ও বুড়ো লিখতে পারে? এ যে রীতিমত মুন্সিয়ানা!

যাকগে ইংরেজী। আমি ওর কি-ই বা বুঝি? অভিনয়টা কিন্তু সত্যিই বুঝি। সখের থিয়েটার অনেক করেছি। ফীমেল পার্টও বাদ যায় নি। রবিবাবুর অভিনয় দেখি নি কখনো। সুরেশ সমাজপতির কাছে তার গল্প শুনেছিলাম একবার। লোকটাকে হয়ত তোমরা রবিবাবুর নিন্দুক বলেই জান। একবার যদি তাঁর মুখে সঙ্গীত-সমাজে রবিবাবুর বিসর্জ্জন অভিনয়ের গল্পটা শুনতে! অতএব ও বস্তু না দেখে মরছি না। তুমি এই চিঠি পেয়েই খবর নেবে আবার কবে হচ্ছে, আর দুখানা দশ টাকার টিকিট কিনবে। তার পর আমাকে জানাবে ও যথাসময়ে এম্পায়ারের সাম্‌নে হাজির থাকবে। কিন্তু তোমারও কি টিকিট লাগবে অমল রবিবাবুর অভিনয়ে? তা লাগে লাগুক।

তোমাদের

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

---

৬ এই অভিনয় দেখিয়া নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু (থিয়েটার-মহলে 'ভুনি বোস' নামে পরিচিত) কলিকাতার ইংরেজী দৈনিক 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজে' এক সুদীর্ঘ প্রশস্তি প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার তৎকালীন সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত হোমের আমন্ত্রণেই অমৃতলাল এই রচনা লেখেন।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া ২৪-২-২৭

অমল,

তোমার চিঠির জবাব দিতে পারি নি, অথবা এই মনে ক'রে দিই নি যে, দেখা হ'লে সমস্ত কথা জানাবো। তোমার "অতি-আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য"[৭] আমি সেই দিনই আগাগোড়া পড়ে ফেলেছিলাম। তোমার বক্তব্য বিষয়ের মূল বস্তুটি আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। দু-একটা কথা হয়ত না বল্‌লেই হ'ত; তবে কেউ না বললেই বা বলা হয় কিরূপে? একটু দীর্ঘ হয়ে গেছে। আর একটু ছোট হ'লে একটা সুবিধে এই হ'ত যে, কোনো ব্যক্তির সম্বন্ধেই একবারের বেশী বার বলবার স্থান থাকত না। তীক্ষ্ণতা একটু কম হ'ত।

কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে এর মধ্যে টেনে না আনলে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুশী হ'তাম। যদি বল, 'আপনাকে আনলাম কি ক'রে?' তার উত্তরে আমি বিষ্ণু শর্ম্মার কৃষক ও শৃগালের গল্প উল্লেখ করতে পারি। শৃগাল বলেছিল—'ভাই, তুমি মুখে যেমন চুপ করেছিলে, তেম্‌নি আঙুলটিও যদি না আমার দিকে নির্দ্দেশ ক'রে রাখতে! ভাগ্যি, শিকারীরা তোমার আঙুলের দিকে নজর করে নি।'

তাই না অমল? "গোর্কি, শেখব, শরৎ চন্দ্র কি,—" তার পরে আর সমস্ত প্রবন্ধের ভেতর শরৎ চন্দ্রের নামগন্ধ নেই! রবিবাবুর

---

৭ ১৩৩৩ সালের মাঘ-সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' দ্রষ্টব্য।

নানাবিধ উদাহরণ তোলবার পরে যদি অন্ততঃ, আমার ওই রকম দু-একটা গল্প, যেমন "রামের সুমতি," "বিন্দুর ছেলে" প্রভৃতি,—অর্থাৎ দুর্নীতি বা অশ্লীলতা দোষ যাতে নেই,—ইঙ্গিতেও তুমি তা উল্লেখ করতে ত এটা বোঝা যেত, তুমি ঠিক এঁদের মধ্যে আমাকে ঠাঁই দিতে চাও নি ।

তোমার মুখ থেকে যদি না আমি নিজে আমার সাহিত্যের সম্বন্ধে তোমাব মতামত বহু বার শুনে আস্তাম, তবে অনেকের মতো আমারও মনে হ'ত, তুমি ইঙ্গিতে এঁদের সকলের আগে আমাকেই দাঁড় করিয়েছ। অথচ, তুমি তা করো নি এবং করবার সঙ্কল্পও ছিল না তোমার।

যাই হোক, তোমার রচনা প্রভৃতি অতি চমৎকার হয়েছে। আমাব আশীর্ব্বাদ জেনো।

তোমাদের
শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩০-১২-২৭

পরম কল্যাণীয়েষু,

অমল, তোমার বিয়েতে থাকতে পেরে ভারী খুশী হয়ে এসেছি। তুমি জান খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে আমার একটু বাছবিচার আছে, কিন্তু সেদিনের ঐ বিরাট পংক্তিভোজনেও ভারি তৃপ্তি ক'রে খেয়েছি। নির্ম্মল আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে খাওয়ালেন। আর এক পাশে ছিলেন তোমাদের জে সি মুখার্জি। ভারী অমায়িক লোকটি।

সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে তোমার ও নববধূর শুভ কামনা করি। আমার সামান্য স্নেহোপহার বৌমার হাতেই দেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভীড় ঠেলে তোমাদের কাছে ভিড়তেই পারলাম না। তাঁকে বোলো।

আশীর্বাদক

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ—অনেক দিন পরে সেদিন বিবাহসভায় রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম। কি আশ্চর্য্য সুন্দর,—চোখ ফেরানো যায় না। বয়স যত বাড়ছে রূপ যেন তত ফেটে পড়ছে। না, রূপ নয়—সৌন্দর্য্য। জগতে এত বড় বিস্ময় জানি না। শ।

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া

৮ই অগ্রাণ,'৩৮ [নবেম্বর, ১৯৩১]

ভাই অমল,

এই সঙ্গে লেখাটা[৮] পাঠালাম। দেখতেই পাবে কারুকার্য্যের ছটায় অভিভূত করবার চেষ্টামাত্র করি নি ; কারণ সেটা অসম্ভব।

তবে, তোমার নিজের দায়িত্বে কিছু ক'রে কাজ নেই। যাঁরা কমিটিতে আছেন, তাঁদের সকলের মত নাও। বড় অসুস্থ, তাই যেতে পারলাম না।

---

৮ ১৩৩৮ সালের পৌষ (ডিসেম্বর, ১৯৩১) মাসে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব "রবীন্দ্র-জয়ন্তী" উপলক্ষ্যে রচিত মানপত্র।

একটা কথা তোমাকে বার বার জানিয়েছিলাম যে, আমি এ-কাজের উপযুক্ত নই। কিন্তু তুমি ত কিছুতেই শুনলে না!

তোমার
শরৎ-দা

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া
২৮শে পৌষ, ১৩৩৮ [জানুয়ারি, ১৯৩২]

পরম কল্যাণীয়েষু,

অমল, ফিরে এসে অবধি ভাবছি তোমাকে লিখব কিন্তু শরীরে দেয় নি। আমি চিরকাল ঘুমকাতুরে মানুষ, কিন্তু কি যে হয়েছে জানি নে,—আমার ঘুম যেন কোথায় পালিয়েছে। শরীরে এমন অস্বস্তি কখনো বোধ করি নি। পায়ের একটা পুরোনো ব্যথাও যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

সত্যি অমল, আমি যে কতখানি খুশী হয়ে এসেছি। সে তোমরা (না তুমি ?) টাউন হলে সভাপতির আসনে আমাকে টেনে বসালে[১], আমার গলায় মালা দিলে ব'লে নয়,—আমার লেখা মানপত্র কবির হাতে দিলে ব'লেও নয়—যে ভাবে এই বিরাট ব্যাপারটি সম্পন্ন হ'ল, এ অনুষ্ঠানটিকে যে নিষ্ঠায় শ্রমে ও শ্রদ্ধায় সার্থক ক'রে তুললে,—তাতেই আমার আনন্দ, অকপট আনন্দ। কবির সম্বন্ধে আমি এখানে ওখানে কখনো কখনো মন্দ কথা বলেছি রাগের মাথায়, এ যেমন সত্যি—এও তেম্‌নি সত্যি যে, আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত কেউ নেই,—আমার

১ রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনার জন্য যে সম্মেলন হয়, সে সভার অধিনায়ক ছিলেন শরৎ চন্দ্র।

চাইতে তাঁকে কেউ বেশী মানে নি গুরু ব'লে,—আমার চাইতে কেউ বেশী মক্‌সো করে নি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আমার চাইতে বেশী বার কেউ পড়ে নি তাঁর উপন্যাস,—তাঁর চোখের বালি, তাঁর গোরা, তাঁর গল্পগুচ্ছ। আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা প'ড়ে ভাল বলে, সে তাঁরি জন্য। এ সত্য, পরম সত্য আমি জানি। আর কেউ বললে কি না-বললে, মানলে কি না-মানলে তাতে কিছু এসে যায় না। তাই আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে যোগ দিয়েছি এই জয়ন্তীতে, না দিয়ে পারি নি। মস্ত বড় কাজ করেছ তুমি। প্রাণ ভ'রে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি।

শুনেছি তুমি এই জয়ন্তী ক'রে কলকাতায় বাড়ী তুলছ, গাড়ী হাঁকাচ্ছ! তোমার আমার বন্ধুরাই এ কথা পরম উৎসাহে প্রচার করছেন। জয়ন্তীর গোড়ায় এও শুনেছি স্বয়ং কবি তোমাকে খাড়া করেছেন, তাঁর শিখণ্ডী মাত্র তুমি—পেছনে থেকে তিনিই তোমাকে সব করাচ্ছেন! এ যে বাংলাদেশ অমল। 'সোণার বাংলা।' তবু বলতে হবে—'আমি তোমায় ভালবাসি!'

মনে কোনো ক্ষোভ রেখো না—যে যা বলে বলুক। আমি জানি তোমার বাড়ী হয় নি, গাড়ীও হয় নি—যে গাড়ী চড়ে বেড়াও সে বুঝি কর্পোরেশনের। বাস্, ঐ পর্য্যন্ত। তা না হোক্—তোমার ভাল হবে। দেশের মুখ রেখেছ তুমি। তোমাকে সমস্ত অন্তর থেকে আবার আশীর্ব্বাদ জানাই।

তোমার

শরৎ-দা

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট, হাবড়া
১০ই মাঘ, '৩৮ [জানুয়ারি, ১৯৩২]

অমল,

তোমার চিঠি পেয়ে ভারী খুশী হলাম। রাতদিন একটা কেদারায় কাৎ হয়ে পড়ে আছি আমার সেই বারান্দায়, আর ঢেউ গুন্‌ছি। তুমি এলে জমবে ভাল। মুখোমুখি ব'সে অনেক দিন গল্প করি নি তোমার সঙ্গে। দেখ, আড্ডা জিনিসটা উঠে যেতে বসেছে—দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এ যে কত বড় অবনতি, তা যদি কেউ জানত! মনে পড়ে দ্বিজেন মৈত্রের সেই হাসপাতালের ছাদে গঙ্গার আলো হাওয়ায় তোমাদের সেই আড্ডা—আর শিবপুরে তাঁর ভাই সুরেন মৈত্রের ওখানে, সেও ঐ গঙ্গার ধারে। মনে পড়ে, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সেই ন্যাড়া ছাদে আমাদের যমুনা আপিসের আড্ডা। ফণীর ওখানেই প্রথম দেখি তোমাকে। তুমি আর প্রভাত। কি তার্কিকই না ছিলে তোমরা দুটি বন্ধু। আর কি পাকা! কতই বা তখন বয়স তোমাদের। সমানে তাল ঠুকে গিয়েছ আমাদের সঙ্গে। তার পর তোমাদের সেই ভারতীর আড্ডা। তেমনটি আর হবে না। আচ্ছা, শান্তিনিকেতনে কবির আড্ডাটা কেমনতরো হয় বলো দিকি। কিন্তু সে আড্ডায় হয়তো তিনিই শুধু কইবেন কথা—অন্যে রবে নিরুত্তর। মনোপলীতে আড্ডা জমে না—শুধু সলিলোকীতে যেমন জমে না নাটক। ইতি—

আঃ শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুনঃ—পার তো নীহারকে সঙ্গে এনো। তোমার ভাইটিকে আমার ভারী পছন্দ। শ।

বেহালা, ১৮ই ভাদ্র, ১৩৩৯

কল্যাণীয়েষু,

অমল, তুমি মনিকে[১০] ফোন ক'রে ছবি তোলবার সময়টা ঠিক ক'রে নিও। Bourne Sheperdএর টাকাটা মনিই দেবে, তোমাদের কাগজের লাগবে না।

সকালের দিকেই আমার সুবিধে। দুকুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে গড়গড়ার পর একটু গড়াগড়ি না দিলে বুড়ো মানুষ বাঁচব কি ক'রে? আমার জয়ন্তী করতে ব'সে নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে মারবার সঙ্কল্প কর নি! রবিবাবু যে মারা পড়েন নি, সে নেহাৎ তাঁর পুণ্যে। বাস্ রে বুড়োকে নিয়ে তোমরা কি টানা হ্যাঁচড়াটাই না করেছিলে। পারেনও বটে উনি। কিন্তু আমি রবিঠাকুর নই, আমি—

শরৎ চাটুজ্যে!

হাবড়া, ৫ই আশ্বিন, ১৩৩৯[১১]

অমল, উদ্‌যোগপর্ব্বে উৎসাহ ক'রে তুমি যে সভাপর্ব্বের পূর্ব্বেই ব্যাধিশরশয্যা গ্রহণ করলে, এতে আর যেই দুঃখ করুক, তোমার দুঃখের কিছু নেই। তুমি যে সেদিন টাউন হলে থাকতে পার নি, তাতে তোমার সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছ। সেদিন যারা ভণ্ডুল করেছিল রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময়েও তারাই ছিল। তারা সাহিত্যিক। তাদের

---

১০ বেহালার সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়।

১১ ১৩৩৯ সালের ৩১শে ভাদ্র শরৎ চন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে টাউন হলের সম্বর্দ্ধনা-সভা কয়েক জনের সঙ্ঘবদ্ধ গণ্ডগোলে "ভণ্ডুল" হইয়া যাবার পর লিখিত।

আমি চিনি—তুমিও চেন। তারা সে-বার পারে নি—এবার পেরেছে। আশ্চর্য্য হই নি। রবিবাবুর অমল হোম ছিল, আমার নেই কিম্বা থেকেও ছিল না। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুঃ—কেমন থাক জানিও। আসবো একদিন।

* * *

[লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত]

৭ ভাদ্র ১৩২৬

[২৪ আগষ্ট ১৯১৯]

...আমার একটু পরিচয় চাই না কি? কিন্তু রাজলক্ষ্মী আবার কে? কেউ নেই।... ...শ্রীকান্তটা আর একবার পড়ে দেখো। হয়ত তার ওপর ঘৃণাই হবে। কিন্তু সব কল্পনা, সব কল্পনা, বেবাক্ মিথ্যে। তার পরে আমার বিদ্যেসিদ্যে কিছু নেই। বড় দরিদ্র ছিলাম—২০টি টাকার জন্যে একজামিন দিতে পাই নি। এমন দিন গেছে যখন ভগবানকে জানাতাম, হে ভগবান, আমার কিছু দিনের জন্যে জ্বর ক'রে দাও তাহ'লে দু-বেলা খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না, উপোস ক'রেই দিন কাটবে। অবশ্য বেশী দিনের জন্যে এ অবস্থা ছিল না। মায়ের মৃত্যুর পরে বাবা প্রায় পাগলের মতো হয়ে যা কিছু ছিল সমস্ত বিলিয়ে নষ্ট ক'রে দিয়ে স্বর্গগত হন।...তার পরে পড়তে সুরু করি। ১৪ বছর ১৪ ঘণ্টা ধ'রে পড়ি। সেই যে একজামিন দিতে পারি নি কেবল সেই

রাগে। বর্ম্মার রেঙ্গুনে ছিলাম কেরাণী--হঠাৎ বড় সাহেবের সঙ্গে মারামারি ক'রে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই ব্যবসা আরম্ভ করেছি। কিন্তু অকস্মাৎ এমনি কপাল ফিরে গেল যে রাতারাতিই একটা বিখ্যাত লোক হয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে সন্ন্যাসীর চেলা হয়েও দিন কাটাতে ছাড়ি নি। আমার এই জীবনটা আগাগোড়াই যেন একটা মস্ত উপন্যাস। এবং এই উপন্যাসে সব কাজই করেছি, কেবল ছোট কাজ কখনো করি নি। যখন মরব—ফর্সা খাতা রেখে যাবো—যার মধ্যে কালির আঁচড় এক জায়গাও থাকবে না।

বাজে শিবপুর। হাওড়া।
৯ই আগষ্ট '২০

পরম কল্যাণীয়াসু,—···আমার মানসিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন তুমি বহু দিন হইতে করিয়া আসিতেছ, এবং বহু দিন হইতেই আমি নীরবে আছি। কিন্তু আমার মত যখন তোমার বয়স হইবে, তখন হয়ত ইহা বুঝিতেও পারিবে যে জগতে মানুষের এমন কথাও থাকিতে পারে যাহা কাহারও কাছে ব্যক্ত করা যায় না। গেলেও তাহাতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের মাত্রাই বাড়ে। অথচ, এই নীরবতার শাস্তি অতিশয় কঠিন।

ভীষ্ম যে একদিন স্তব্ধ হইয়া শরবর্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন সে কথাটা চিরদিনের জন্য মহাভারতে লেখা হইয়া গেল, কিন্তু কত অলিখিত মহাভারতে যে এমন কত শরশয্যা নিত্যকাল ধরিয়া নিঃশব্দে রচিত

হইয়া আসিতেছে তাহার একটা ছত্রও কোথাও বিদ্যমান নাই। এমনি করিয়াই সংসার চলিতেছে।...

তোমার এই দাদাটির অনেক বয়স হইয়াছে, অনেকের অনেক প্রকারের ঋণ এ নাগাদ শোধ করিতে হইয়াছে, তাহার এই উপদেশটা কখনো বিস্মৃত হইয়ো না যে, পৃথিবীতে কৌতূহল বস্তুটার মূল্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া যত বড়ই হোক, তাহাকে দমন করার পুণ্যও সংসারে অল্প নয়।

যে বেদনার প্রতিকার নাই, নালিশ করিতে গেলে যাহার নীচেকার পঙ্ক জেরায় জেরায় একেবারে উপর পর্য্যন্ত ঘুলাইয়া উঠিতে পারে, সে যদি থিতাইয়া থাকে ত, থাক্ না। কি সেখানে আছে নাই-বা জানা গেল। কি এমন ক্ষতি?...

দুঃখের ব্যাপারে আমিই সকলকে ছাড়াইয়া চলিয়াছি, আর সবাই আমার পিছনে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া আসিতেছে—এ ধারণা সত্যও নয়, সাধুও নয়। সৌভাগ্যের দম্ভে রাবণকে পড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু দৈন্য ও দুর্ভাগ্যের অহঙ্কারে গৌতমীকে যখন সমস্ত অর্জ্জিত পুণ্যের জরিমানা দিতে হইয়াছিল, তখন সে বিচার ইংরাজ হাকিমের আদালতেও হয় নাই, কালা-গোরার মকদ্দমায় পিনাল কোডের ধারাতেও নিষ্পত্তি হয় নাই।...বই আমি যাই লিখি না কেন, এলোমেলো চিঠি লেখায় আমার সমকক্ষ হইতে পারে এরূপ ব্যক্তি যথেষ্ট নাই। ('পূর্ব্বাশা,' শরৎ-স্মৃতি-সংখ্যা, পৌষ-মাঘ ১৩৪৪)

* * *

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত]

বাজে শিবপুর। হাবড়া
২৮. ৪. ২৫

…শরীরটা তেমন সুস্থ নয়।

ভেলু বেঁচে নেই। গত বৃহস্পতিবারের আগের বৃহস্পতিবারে আমি ঢাকা থেকে সকালে এসে পৌঁছাই। তখনি বেলগেছে হাঁসপাতাল থেকে তাকে মোটরে ক'রে বাড়ী আনি। এসেই কিন্তু সে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়ে। ডাক্তারেরা বলেন acute gastritis. সাত দিন সাত রাত খাই নি ঘুমুই নি—তবুও পরের বৃহস্পতিবার ভোর ৬টার সময় তার প্রাণ বার হয়ে গেল। শেষ দিন বড় যন্ত্রণা পেয়েই সে গেছে।

বুধবারে জোর ক'রে কড়া ওষুধ খাওয়াবার চেষ্টা করি, চামচে দিয়ে মুখে গুঁজে দেবার অনেক চেষ্টা ক'রেও ওষুধ তার পেটে গেল না; কিন্তু রাগের ওপর আমাকে কাম্‌ড়ালে। সেদিন সমস্ত রাত আমার গলার কাছে মুখ রেখে কি তার কান্না! ভোরবেলায় সে কান্না তার থাম্‌লো।

আমার ২৪ ঘণ্টার সঙ্গী, কেবল এ দুনিয়ায় আমাকেই সে চিনেছিল। যখন কাম্‌ড়ালে এবং সবাই ভয় পেলে তখন রবিবাবুর এই কথাটাই শুধু মনে হ'তে লাগ্‌লো—তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাইক অবহেলা! তার আঘাত ছিল, কিন্তু অবহেলা ছিল না। এর পূর্ব্বে এত ব্যথা আমি আর পাই নি।

…ডাক্তার প্রভৃতি বহু বন্ধু বান্ধবেই এখন ধরেছেন চিকিৎসা করতে। অর্থাৎ পাগ্‌লা কুকুর কাম্‌ড়ানোর পরে যা করা উচিত। উচিত যা তাই চল্‌বে। ২৮টা injectionএর আজ ১০টা injection হয়ে গেল। আরো ১৮টা বাকি। তাও সম্পূর্ণ হবে। মানুষকে বাঁচতেই হবে, কারণ, Your life is too valuable ! দেখাই যাক্ valuable lifeএর শেষটা কি দাঁড়ায় ! তোমার শরৎ ('কালি-কলম,' ভাদ্র ১৩৩৫)

*   *   *

[?]

বাজে শিবপুর। হাবড়া

২৯. ৬. ২৫

মা, তোমার চিঠি পেয়েছি। শরীর আমার বেশ ভালই আছে। কোন অসুখ বিসুখ নেই, তুমি আমার জন্যে ভেবো না। হরিদাস তোমাকে বাড়িয়ে বলেছে।

হরিদাস আমার ছোট ভাইয়ের মত। আমার মত সেও তোমাকে দেখবে। তাকে সকল কথা জানিয়ো। অমন ভাল ছেলে কাশীতে আর নেই। তা' ছাড়া সে নিজে চিকিৎসক।

প্রভাসের বৃন্দাবন থেকে শীঘ্র আসার কথা আছে, সে এসে পড়লে আমি কাশীতে একবার যেতে পারি।

প্রকাশের বিয়ে হয়ে গেছে, দিদি এখন এখানেই আছেন।

তুমি বাসা বদল ক'রে ভালই করেছ। এ ঘর কি তোমার পছন্দ-মত হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে ত, হয়ত ২।১ টাকা ভাড়া বেশী দিলে অপেক্ষাকৃত ভাল ঘর পাওয়া যেতে পারে। তোমার বাড়ীভাড়ার জন্যে চিন্তা করার আবশ্যক নেই, কারণ সে টাকা হরিদাস দেবে। তোমার কাছে তারা বাড়ীভাড়া চাইবেও না।

তুমি আমাকে মাঝে মাঝে তোমার খবর দিয়ো, তোমার সকল কথা আমি হরিদাসের কাছেই শুন্‌তে পাবো।

আমার সেই ভোলা চাকরটির বড় অসুখ। চিকিৎসা চল্‌ছে, অল্প বয়স, তাই আশা হয় সে সেরে উঠবে। তোমার শরৎ[১]

* * *

---

১ শ্রীযুক্ত হরিদাস শাস্ত্রী লিখিয়াছেন:—"বুড়ীমা সম্বন্ধে দাদা একবার লিখিয়াছিলেন—'বুড়ীমা দুঃখে পড়ে একদিন আমায় ছেলে বলেছিলেন—এখন কাশীতে আছেন ...ঠিকানায়:খোঁজ নিও। বুড়ীমা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে ও বধূ ছিলেন। বালবিধবা। বেশ পড়াশুনা ছিল—বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের অনেক গল্প করিতেন। খুব মালপো তৈরি করিতে পারিতেন ও খাওয়াইতেন। শেষ বয়সে চোখটা খারাপ হইয়াছিল বলিয়া পড়িতে পারিতেন না।'—শরৎ চন্দ্র আমার হাত দিয়া তাঁকে কিছু সাহায্য করিতেন।... চিঠিখানি ছাপানর উদ্দেশ্য—কি ভাবে নিজেকে গোপন রাখিয়া তিনি সাহায্য দান করিতেন, তার একটা প্রমাণ এর মধ্যে আছে। চিঠিতে লিখিতেছেন বাড়ীভাড়া যা কিছু হরিদাস দিবে, উহা আত্মগোপনের প্রকার মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে টাকা তিনি আমার কাছে পাঠাইতেন আমি বুড়ীমাকে দিতাম।" ('সাহানা,' ১৩৪৬)

[শ্রীহরিদাস শাস্ত্রীকে লিখিত]

শিবপুর হাওড়া

[১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬]

পরম কল্যাণবরেষু

কাল বাড়ী থেকে এসে তোমার চিঠি পেলাম। আমার অভ্যাসের দোষে বহু দিন তোমাকে পত্র দিতে পারি নি। জানি অন্যায় যে কত বেশী হচ্ছে, তবু হয়ে ওঠে নি, এমনি কুড়েমি আমার। তবে সান্ত্বনা এইটুকু যে তোমরা ছোট ভাইয়ের মত, দাদার অপরাধ নেবে না।···

আমার যথাপূর্ব্বং। যদি না ঢের বেশী বেড়ে গিয়ে থাকে। Constipation আমাকে নিয়ে তবে যাবে এইটেই অবশেষে স্থির হয়েছে—যাক্, একটা কিছু এত দিনে বোঝা গেছে। অথচ দেশে গিয়ে জলবায়ুর গুণেই হোক বা কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রম করি ব'লেই হোক—এ রোগটা ঢের কমে থাকে। অতএব, শেষ চেষ্টার জন্য সপরিবারে শিবপুর ছেড়ে রূপনারায়ণ নদের তীরেই বছর খানেক বাস ক'রব ঠিক করেছি। খুব সম্ভব, এই ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই সকলে চলে যাবো।···

তুমি কেমন আছ হরিদাস? সব ভাল ত? কেদারবাবু শুনেছি আমার সম্বাদের জন্য ব্যস্ত। বাস্তবিক আমাকে তিনি কি চোখেই যে দেখেছিলেন! কিন্তু ভুল করেছিলেন—আমি তার যোগ্য নই।

কিছু দিন থেকে শিবপুরে আর প্রায়ই থাকি না, মন ভাল লাগে না। কোথায় যে লাগবে তাও ছাই ভেবে পাই নে। দেখি এবার বাড়ী গিয়ে গোলাপের আর জুঁই মল্লিকের চাষ করে।

যাবার সময়ে বুড়ো বয়সে ওদিকের পথটা ভগবান কি বন্ধুর করেই রেখেছেন। আত্মীয় বন্ধুজনদের আশীর্ব্বাদ করতে ইচ্ছে হয়—যৌবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন ইহকালের মিয়াদ ফুরোয়। ইতি ৫ই ফাল্গুন ১৩৩২।—দাদা

১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

সামতা-বেড়, পানিত্রাস পোষ্ট

জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

হরিদাস, তোমার দুখানি চিঠিই আমি পেয়েছি। তোমার দেওয়া ওষুধও অনেক বিলম্বে ভাঙা-চোরা অবস্থায় আসে, দিন দুই ব্যবহারও করি কিন্তু মনে হ'ল লোকে ঘাঁটা-ঘাঁটি করেছে, তাই আর খেলাম না। ওষুধ পাই নি, পেলাম শুধু তোমার সত্যকার শ্রদ্ধা এবং স্নেহ। এখন অনেকটা ভাল আছি। কিন্তু মানসিক অশান্তি না হোক্, অস্থিরতার আর সীমা নেই। এখন কেবলি অনুশোচনা হয় সেই আমার বর্ম্মার ছোট্ট চাকরিটুকুর জন্যে। মনে হয়, এ জীবনে ঐ চাক্‌রি ছাড়া আর যদি কিছুই না করতাম!

দেনা-পাওনা যদি তুমি অনুবাদ কর ত তোমার ইচ্ছে এবং বুদ্ধি মতই ক'রো। বাঙ্‌লার হিন্দী অনুবাদ হওয়াই এক বিড়ম্বনা, তার পরে অক্ষর অক্ষর ছত্র ছত্র translate করবার ব্যর্থ চেষ্টায় যদি ভাবটুকুও

যায় ত বাস্তবিকই খুব দুঃখের কথা। তবে এ দুঃখ থেকে বাঁচবার পথ নেই যখনই আমি হিন্দীতে অনুবাদ করার অনুমতি দিয়েছি।

তুমি বাঙ্লা ত খুব ভালই বোঝ, কিন্তু হিন্দী জানো কেমন? বস্তুতঃ, অত বড় বইটার সমস্ত হিন্দী করার মত শক্ত ব্যাপার আমি ত ভাবতেই পারি নে। যদি এত বড় অধ্যবসায় তোমার থাকে ত মাঝে মাঝে কেদারবাবুকে দেখিয়ো। তিনি চিন্ মুল্লুক ঘুরে এসেছেন, তাঁর অভিজ্ঞতা আছে।

এবার একটু জলটল প'ড়ে ঠাণ্ডা হ'লেই কাশী যাবো। মাস ২।৩ থাক্‌বোই। তাতে প্রাণ থাকে আর যায়। কেদারবাবু কেমন আছেন? যদি সাক্ষাৎ হয় আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানিয়ো।

তোমার মন ত নানা কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে আছে—শান্তি স্বস্তি পাবার উপায়ও বড় হাতে নেই, এ অবস্থায় অনুবাদ করার মত অকেজো কাজে আবদ্ধ করলেও সময় কাটে। আর সংসারে কাজের মত কাজই বা কাকে বলে তাও বোঝা ভার।

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো এবং আমি চিঠির উত্তর সকল সময়ে দিতে পারি বা না-পারি মাঝে মাঝে তোমার শারীরিক কুশল সম্বাদ দিয়ো। দাদা। ইতি ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩।

তুমি অনুবাদ সুরু ক'রে দাও।

আমার সম্পূর্ণ অনুমোদন রইল।

* * *

[শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়কে লিখিত]

সামতা বেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া। ১লা জুন '২৭

পরম কল্যাণীয়েষু, মণীন্দ্র তোমার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছিলাম, কিন্তু কতকটা দিচ্ছি দেব এবং কতকটা দেহের অবস্থাবশতঃ জবাব দিতে দেরি হয়ে গেল।

তুমি আমার এখানে আসবে তাতে যে খুশী হব এ তুমি জানো, কিন্তু তোমার কষ্ট হবে। একে ত ভয়ানক গরম, তাতে মাঠের উপর দিয়ে ঠিক দুপুরে আসা বিষম ব্যাপার। একটু জলটল পড়লে আর একদিন এসো। তা ছাড়া ৩রা থেকে ৬ই পর্য্যন্ত আমি শিবপুরে গিয়ে থাক্‌বো। একটু কাজও আছে এবং ২।১ দিন শিশির ভাদুড়ীর থিয়েটারে ষোড়শীর রিহার্সাল দেখবো।

(বইখানা ভারতীতে যখন বার হয় নাটকাকারে রূপান্তরিত করেছিলেন শিবরাম চক্রবর্ত্তী। আমি আবার জাট খোল বদ্‌লে শিশিরের অভিনয়ের জন্যে তৈরি ক'রে দিয়েছি। বোধ হয় নেহাৎ মন্দ হয় নি। যদি হয় একদিন দেখো।)

এই সময়ের মধ্যে একদিন ছুটি ক'রে তোমার ওখানে গিয়ে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা এবং পরে ব্রাহ্মণভোজন সমাধা ক'রে আসবো ভারি ইচ্ছে হয়েছে। তোমাদের বাড়ীর আন্তরিক যত্নের খাওয়াটার প্রতি আমার লোভ যে নেই তা নয়। অন্যান্য মঙ্গল, শুধু অর্শের অজুহাতে অত্যধিক রক্তপাতে কিছু কাহিল করেছে।

আশা করি তোমরা বেশ ভালই আছ। ভূপেন বাবু কেমন আছেন? আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। দাদা

সামতা বেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া। ২৭. ৮. ২৭

পরম কল্যাণবরেষু,—মণীন্দ্র, তোমার চিঠি পেলাম। তোমার চিঠি পড়লে মনে হয় এখ্খুনি যাই, কিন্তু আমি ত ভাই সুস্থ নই, প্রায় দু হপ্তা থেকে influenzaর মত হয়ে ভারি দুর্ব্বল ক'রে রেখেছে। তা' ছাড়া বৃষ্টি বাদলে রেল ষ্টেশনের একটি মাত্র পথ যা' হয়ে আছে তাতে যাওয়ার কল্পনা করতেও ভয় হয়। পাল্‌কি নিয়ে চল্‌তে বেহারা আশঙ্কা করে হয়ত পা পিছলে বাঁধ থেকে একেবারে খালে ফেলে দেবে। আচ্ছা যায়গাতেই এসে পড়েছি। এখানকার লোকের একটা সুবিধে আছে। তাদের এই বর্ষাকালে পায়ে খুর গজায়,—তাতেই দিব্যি খট্ খট্ ক'রে হেঁটে চলে,—পিছলকে ভয় করে না। আমার এখনো ওটা গজায় নি—তবে এরা ভরসা দিয়েছে আরও দু-এক বছর একাদিক্রমে বাস করলেই গজাবে। অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি বলেছি খুরে আমার কাজ নেই, আমি বরঞ্চ যেখানে ছিলাম সেখানেই ফিরে যাবো।

তোমার বাবার সঙ্গে যে কত কাল দেখা হয় নি মনেও করতে পারি নে। অথচ, তাঁর মিষ্টি স্বভাবটুকুর জন্যে তাঁর প্রতি আমার কতই না শ্রদ্ধা। তাঁকে আমার নমস্কার দিয়ো। একটু জোর পেলেই গিয়ে একবার দেখে আসবো।

ষোড়শী অভিনয় আমি একবার মাত্র দেখেছি, এবং তারই জের চল্‌ছে। জলে ভিজে, কাদায় হেঁটে এই influenza; তুমি পারো ত একবার গিয়ে দেখে এসো। বাস্তবিকই শিশির এবং চারুর (জীবানন্দ—ষোড়শী) অভিনয় দেখবার মত বস্তু।

আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। দাদা।

* * *

[শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়কে লিখিত]

সামতাবেড়, পানিত্রাস।

জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

ভূপেন, কিছু দিন পূর্ব্বে তোমার চিঠি পেয়েছি কিন্তু তার পরেই আমাকে কুমিল্লায় যেতে হয়, এবং ফিরে এসেই বাড়ী যাই, এই জন্যে জবাব দিতে দেরি হয়ে গেলো। কিছু মনে ক'রো না। কবে যে তোমরা মুক্তি পাবে এবং কবে যে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে এ কথা এই নির্জ্জন পল্লী-ভবনে ব'সে প্রায়ই ভাবি। সাহিত্য নিয়েই তোমাদের সঙ্গে পরিচয়, এবং নিজের দেশকে সমস্ত মন দিয়ে ভালোবাসো এই জানি, কিন্তু কোন্ অপরাধে যে আবদ্ধ হয়ে আছো ভেবে পাই নে। প্রার্থনা করি যেন অচিরে মুক্তি পেয়ে আবার কর্ম্মের মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে ফিরে আসতে পাবো।

'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসটা যে তোমার এতখানি ভালো লেগেছে এতে ভারি আনন্দ পেলাম। এর ভেতর সামাজিক অনেক প্রশ্নের

আলোচনা আছে, কিন্তু সমাধানের ভার তোমাদের হাতে। ভবিষ্যতের এই সুকঠিন দায়িত্বের সম্ভাবনাই হয়ত তোমাদের এত বড় আনন্দ দিয়েছে। অথচ, আমার ধারণা এ বই বহু লোককেই নিরাশ করবে, তারা কোন আনন্দই পাবে না। একে তো গল্পাংশ নিতান্ত কম, তাতে আবার ভেবে ভেবে পড়তে হয়, হুহু ক'রে সময় কাটানো বা ঘুমের খোরাকের মত নিশ্চিন্ত আরামে অর্দ্ধেক চোখ বুজে উপভোগ করা চলে না। এ ভালো লাগবার কথা নয়। তবুও লিখেছিলাম এই ভেবে যে কেউ-কেউ তো বুঝবে, আমার তাতেই চলে যাবে। সকল প্রকার রস সকলের জন্যে নয়। অধিকারী ভেদটা আমি মানি।

আরও একটা কথা মনে ছিলো সে অতি-আধুনিক-সাহিত্য। ভেবেছিলাম এই দিকে একটা ইসারা রেখে যাবো। বুড়ো হয়েছি, লেখার শক্তি অস্তগতপ্রায়, তবু, ভাবী-কালের তোমরা এই আভাসটুকু হয়ত পাবে যে নোঙ্‌রা না ক'রেও অতি-আধুনিক-সাহিত্য লেখা চলে। কেবল কোমল, পেলব রসানুভূতিই নয়, intellectএর বলকারক আহার্য্য পরিবেশন করাও আধুনিক কালের রস-সাহিত্যের একটা বড় কাজ। এর পরে তোমরাও যখন লিখবে তোমাদেরও অনেক পড়তে হবে, অনেক চিন্তা করতে হবে। শুধু চিত্ত-বিনোদনের হাল্কা ভারটুকু বয়ে দিয়েই অব্যাহতি পাবে না।

জেলের মধ্যে আছো, হাতে সময় অপরিসীম, এ বৃথা যেন নষ্ট ক'রো না এই তোমার প্রতি আমার আদেশ। এই নির্জ্জন বাস পরবর্ত্তী কালে যেন তোমার কল্যাণের দ্বার মুক্ত ক'রে দিতে পারে। বহুর সাহচর্য্যে বহু মানবকে যেন চিন্‌তে পারো। মানুষের স্বরূপের

জ্ঞানটাই সাহিত্যের আসল মালমশলা। এই সত্যটি কোনদিন ভুলো না।

আমার শরীর বুড়ো-বয়সে যেমন থাকা উচিত তেমনিই আছে। ভালো থাকো, নির্ব্বিঘ্নে থাকো এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ '৩৮

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* * *

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে লিখিত]

কল্যাণীয়েষু—লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি দেশের সাপ্তাহিক পত্রগুলি ক্রমশঃ দশের উৎসুক ও উৎকণ্ঠ দৃষ্টি লাভ করিতেছে। পূর্ব্বেকার উপেক্ষা অবহেলার ভাব আর নাই। অর্থাৎ মানুষের নিত্যকার প্রয়োজনে এইগুলির প্রয়োজনীয়তাও মানুষে এখন উপলব্ধি করিতেছে। আনন্দের কথা। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠার আসনটি কেবল মাত্র দখল করিয়া রাখিলে চলিবে না, কাজের মধ্যে দিয়া স্বকীয় মর্য্যাদা প্রতি দিন প্রমাণিত করিতে হইবে, নিরন্তর মনে রাখিতে হইবে তোমার কর্ম্মশীলতা সাধারণের সৌভাগ্য ও কল্যাণ সমৃদ্ধ করিতেছে। আর কোন পন্থায় নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলা কাগজের পক্ষে শুধু ব্যর্থতা নয় বিড়ম্বনা।

তোমাকে ছেলেবেলা হইতে জানি, তোমার আদর্শ তোমার অভিজ্ঞতা কত দিন আমার কাছে আলোচনা করিয়াছ, কনিষ্ঠের মতো

উপদেশ চাহিয়া লইয়াছ। জীবনের পথে সে সমুদয় তুমি বিস্মৃত না হও এই ইচ্ছা করি।

কাগজ পরিচালনার কাজ কেবল মাত্র দায়িত্বপূর্ণ ই নয়, নানা ভাবে বিঘ্নসঙ্কুল। বিবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হয়। অধিকাংশই সাময়িক নিঃসন্দেহ, তথাপি সংযম ও সহিষ্ণুতার অত্যন্ত প্রয়োজন। জানি নির্ভীক আলোচনা সাপ্তাহিকের প্রাণ, কর্ত্তব্যবিমুখতা অপরাধ, তবু বলি তার চেয়েও মহার্ঘ তোমার আপন চরিত্র ও মর্য্যাদা। অসৌজন্য ও কুকথায় তোমাব মুখের বক্তব্য যেন কোন দিন কলুষিত না হয়। কাহাকেও ছোট করার জন্য নয়, বড করার উদ্যমেই তোমার প্রবুদ্ধ শক্তি অনুক্ষণ নিয়োজিত থাক এই প্রার্থনা করি। প্রগতির পথে জয় তোমার অপ্রতিহত হইবেই। ইতি ৭ই শ্রাবণ ১৩৪২

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* * *

[শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যকে লিখিত]

২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড, কলিকাতা
২৮শে বৈশাখ ১৩৪৪।

কল্যাণীয়েষু—বুদ্ধদেব, কই আমার চিঠি লেখার কাগজ ত আজো এলো না। সবাই ভুলে গেছে বোধ হয়। আবার প্রচণ্ড জ্বর সুরু হয়েছিল। এবার রক্ত পরীক্ষায় যদিও কিছু পাওয়া গেল না, কিন্তু

ওঁরা স্থির করেছেন এ বস্তু ম্যালোয়ারি ছাড়া আর কিছু নয়।···যাক্ গে রোগের কাহিনী। একটা কথা। আজকাল বড় লোকদের ঘরে মেয়ের নাম প্রায়ই দেখি অঞ্জলি রাখা হয়। কিন্তু সবাই দেন দীর্ঘ ঈ। অঞ্জলিকে অঞ্জলী লিখলে কি স্ত্রীলিঙ্গ হ'তে পারে বুদ্ধদেব? কেউ কেউ বলেন বাঙলায় পারে। কি জানি। সময় মতো একবার এসো। আশীর্ব্বাদ রইলো। দাদা।

সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

১৮৭৬ : পিতা মতিলালের মাতুলালয়—হুগলী, দেবানন্দপুরে জন্ম (১৫ সেপ্টেম্বর, ৩১ ভাদ্র ১২৮৩)।

১৮৭৭-৮৬ : দেবানন্দপুরে বাল্য ও ভাগলপুরে মাতুলালয়ে কৈশোর যাপন।

১৮৮৭ : ভাগলপুরে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাস ও টি. এন. জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে প্রবেশ।

১৮৯৩ : হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ২য় শ্রেণীর ছাত্র।

—সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত।

১৮৯৪ : ব্রাঞ্চ স্কুলে ১ম শ্রেণীতে পাঠকালে ভাগলপুরে গমন ও টি. এন. জুবিলী স্কুলে পুনঃপ্রবেশ। সেখান হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া (ডিসেম্বর) ২য় বিভাগে পাস।

—ভাগলপুরে সাহিত্যসভার সৃষ্টি ও নেতৃত্ব। সভার মুখপত্র—হস্তলিখিত মাসিকপত্র 'ছায়া'।

১৮৯৫ : টি. এন. জুবিলী কলেজে এফ. এ. ক্লাসে যোগদান।

—মাতা ভুবনমোহিনী দেবীর মৃত্যু (নবেম্বর)।

—কলেজের পড়াশুনায় ইস্তফা।

১৮৯৬-৯৯ : খেলাধুলা, সাহিত্যচর্চা। অভিনয়াদি দ্বারা আদমপুর ক্লাবের নাট্য-বিভাগের সুনাম বর্দ্ধন।

—বনেলী এষ্টেটে চাকুরী।

১৯০০ : নিরুদ্দেশ; সন্ন্যাসি-বেশে দেশ-ভ্রমণ।

১৯০২ : সন্ন্যাসি-বেশে মজঃফরপুরে অবস্থিতি ও প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত বন্ধুত্ব।

—ভাগলপুরে পিতার মৃত্যু।

—শ্রাদ্ধাদি-শেষে কলিকাতায় মাতুল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট আগমন।

১৯০৩ : ভাগ্যান্বেষণে বর্ম্মা-যাত্রা (জানুয়ারি) ও রেঙ্গুনে মেসোমশাই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অবস্থিতি।

—'কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন' পুস্তকে মাতুল সুরেন্দ্রনাথের নামে মুদ্রিত "মন্দির" গল্প।

১৯০৫ : মেসোমশায়ের মৃত্যু (৩০ জানুয়ারি)।

—মৌলমিন-পিণ্ডতে ও পরে রেঙ্গুনে ডি এ. জি.-র আপিসে কেরাণীগিরি।

১৯০৭ : 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩১৪) ছেলেবয়সের রচনা "বড়দিদি" উপন্যাস,—মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত প্রথম রচনা।

১৯১২ : অল্প দিনের জন্য রেঙ্গুন হইতে কলিকাতায় আগমন (অক্টোবর ডিসেম্বর)।

—'যমুনা'য় অপরিণত বয়সের রচনা "বোঝা" গল্প।

১৯১৩ : মাতুল উপেন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় 'যমুনা'য় নিয়মিতভাবে রচনা দানে স্বীকৃতি ; পরিণত বয়সের রচনা "রামের সুমতি," "পথ-নির্দ্দেশ" ও "বিন্দুর ছেলে" প্রকাশ।

—'যমুনা'-সম্পাদক কর্তৃক 'বড়দিদি' প্রকাশ,—মুদ্রিত প্রথম পুস্তক।

—'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠায় প্রথম রচনা "বিরাজ বৌ"।

১৯১৪ : 'যমুনা'র অন্যতর সম্পাদক (জুন) ।
—অল্প দিনের জন্য কলিকাতা আগমন (ডিসেম্বর) ।

১৯১৫ : 'যমুনা'র সম্পর্ক ত্যাগ ; 'ভারতবর্ষে'র নিয়মিত লেখক ।

১৯১৬ : স্বাস্থ্যহানির জন্য বর্ম্মা ত্যাগ (১১ এপ্রিল) ।
—বাজে-শিবপুরে অবস্থিতি ।

১৯১৯ : 'বসুমতী' কর্তৃক গ্রন্থাবলী প্রকাশের সূচনা ।

১৯২১ : কংগ্রেসের কর্ম্মে যোগদান ।

১৯২২ : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস হইতে ১ম পর্ব্ব 'শ্রীকান্তে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ ।

১৯২৩ : কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী সুবর্ণপদক' লাভ ।

১৯২৪ : শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের সহযোগে সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র 'রূপ ও রঙ্গ' সম্পাদন (৪ অক্টোবর) ।

১৯২৫ : ঢাকা, মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে সাহিত্য-শাখার সভাপতিত্ব (১০-১১ এপ্রিল) ।
—হাওড়া, পানিত্রাস গ্রামে গৃহ নির্ম্মাণ ।

১৯২৭ : ১ম পর্ব্ব 'শ্রীকান্তে'র ইতালীয় অনুবাদ পাঠে মনস্বী রঁম্যা রলাঁ কর্তৃক পৃথিবীর "প্রথম শ্রেণীর" ঔপন্যাসিকের সম্মান দান ।

১৯২৮ : ৫৩তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে দেশবাসীর সম্বর্দ্ধনা (সেপ্টেম্বর) ।

১৯২৯ : মালিকান্দা অভয় আশ্রমে বিক্রমপুর যুবক ও ছাত্র সম্মিলনীর সভাপতিত্ব (১৫ ফেব্রুয়ারি) ।
—রংপুরে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভাপতিত্ব (৩০ মার্চ) ।

১৯৩১ : রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতিত্ব (ডিসেম্বর)।

১৯৩২ : টাউন-হলে নাগরিক ও সাহিত্যিকগণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন (১৮ সেপ্টেম্বর)।

১৯৩৪ : ফরিদপুর সাহিত্য-সম্মিলনে মূল সভাপতি (২৭ জানুয়ারি)।
—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের "বিশিষ্ট সদস্য" (জুলাই)।
—কলিকাতা অশ্বিনী দত্ত রোডে নবনির্ম্মিত গৃহে প্রবেশ।

১৯৩৬ : সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদকল্পে টাউন-হলে উদ্বোধন-বক্তৃতা (১৫ জুলাই) ও আলবার্ট-হলে সভাপতিত্ব।
—ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "ডি. লিট্" উপাধি লাভ।
—ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজে সভাপতিত্ব (৩১ জুলাই)।
—৬১তম জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অভিনন্দিত (২৫ আশ্বিন)।

১৯৩৮ : কলিকাতা পার্ক নার্সিং হোমে, ৬২ বৎসর বয়সে, মৃত্যু (১৬ জানুয়ারি, ২ মাঘ ১৩৪৪)।